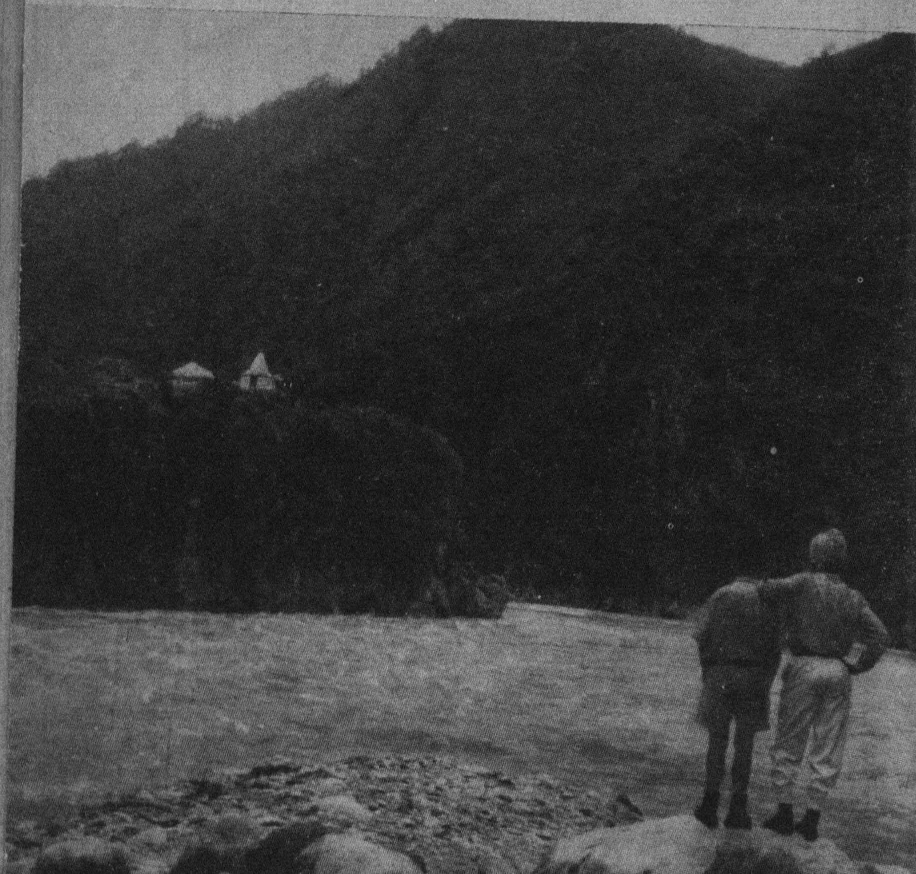
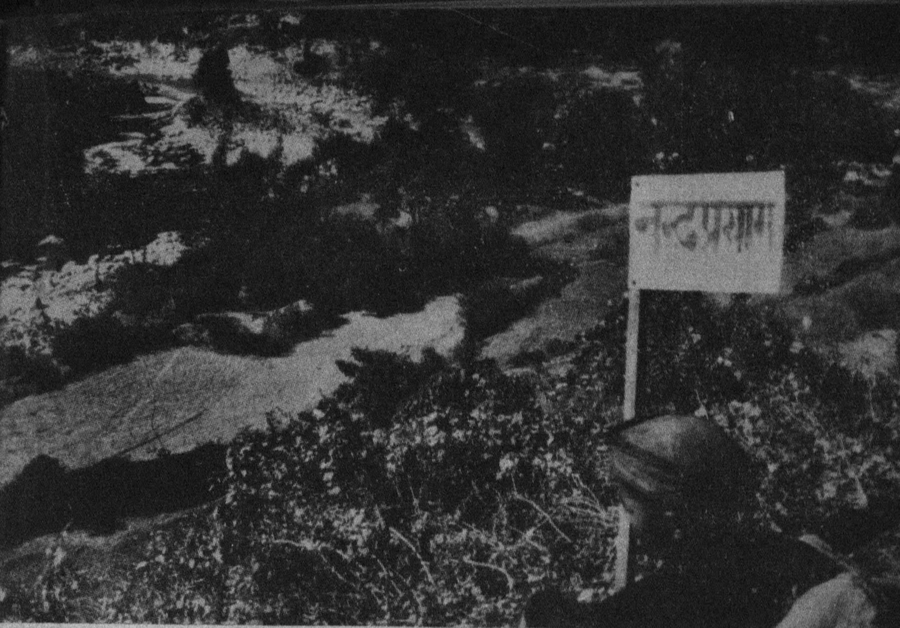
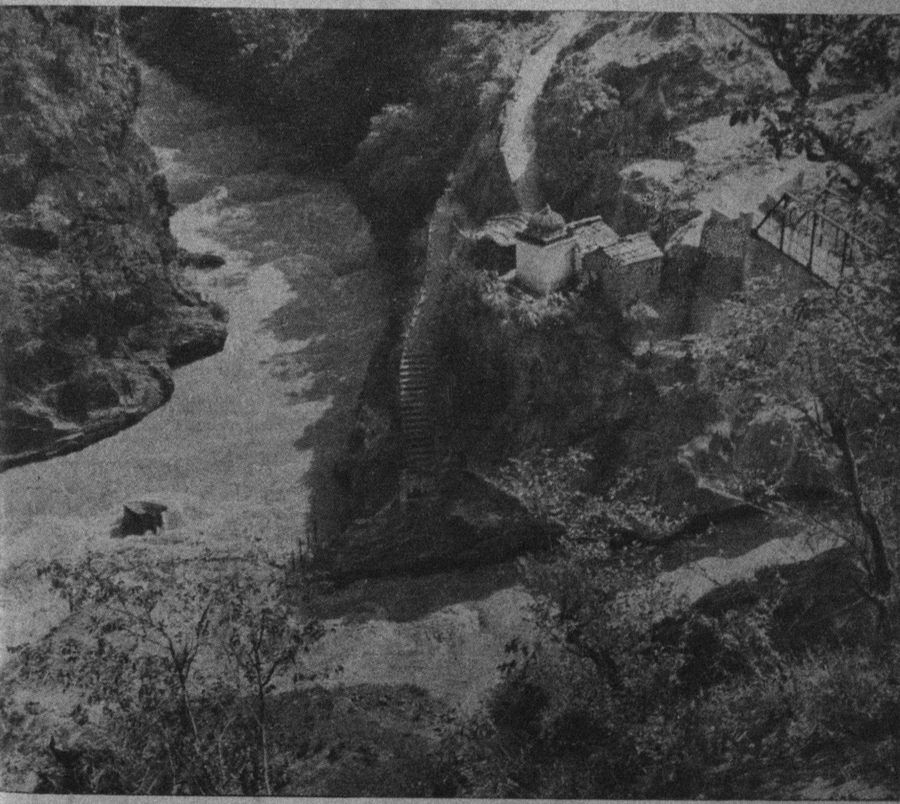


পঞ্চপ্রয়াগ



কর্ণপ্রয়াগ [বীরেন সরকার]





# পঞ্চ প্রয়াগ

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২



কেদারনাথ মন্দির [অসিত বসু]

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট :

দেবপ্রয়াগের আলোকচিত্র—লেখক

বর্ণানুলেপ—শ্রীকানাই পাল

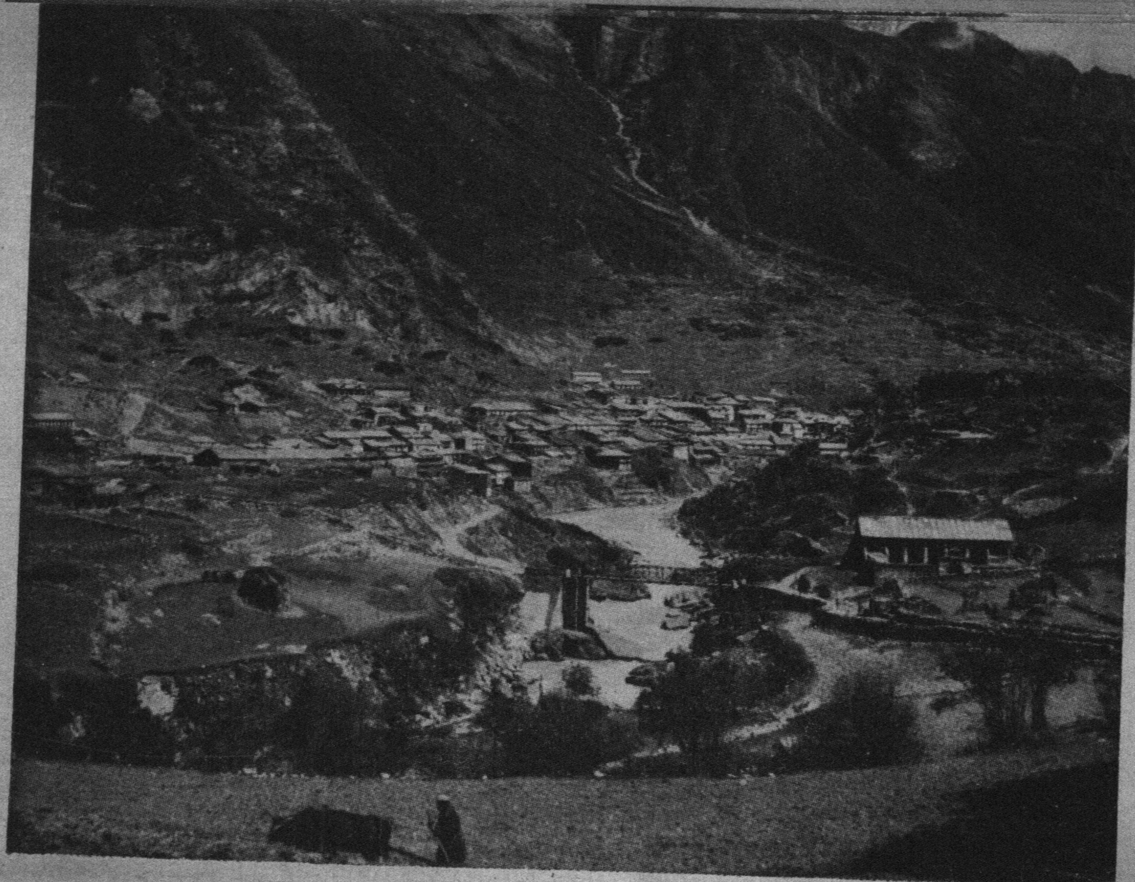
মুদ্রণ—রিপ্রোডাক্‌শন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত

তাপসী প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত




প্রয়াগ-প্রিয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু-কে



বদ্রীনাথ—অলকনন্দার অপর পার থেকে

এই লেখকের :

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

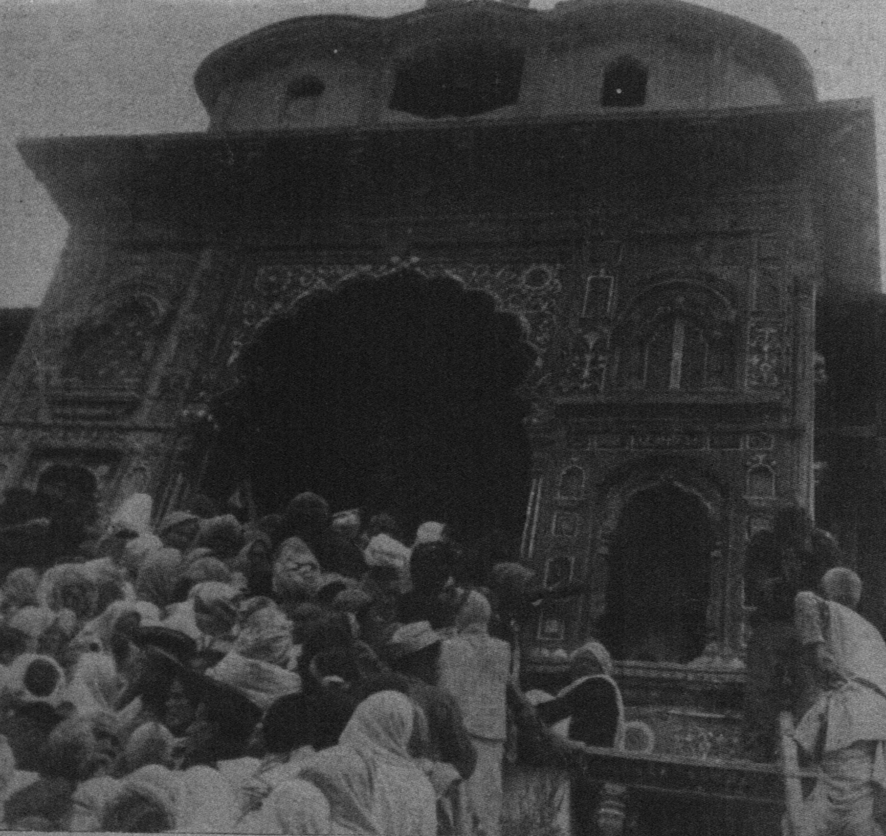
নীল দুর্গম

গহন-গিরি-কন্দরে

গিরি-কান্তার

শেষ শিখা

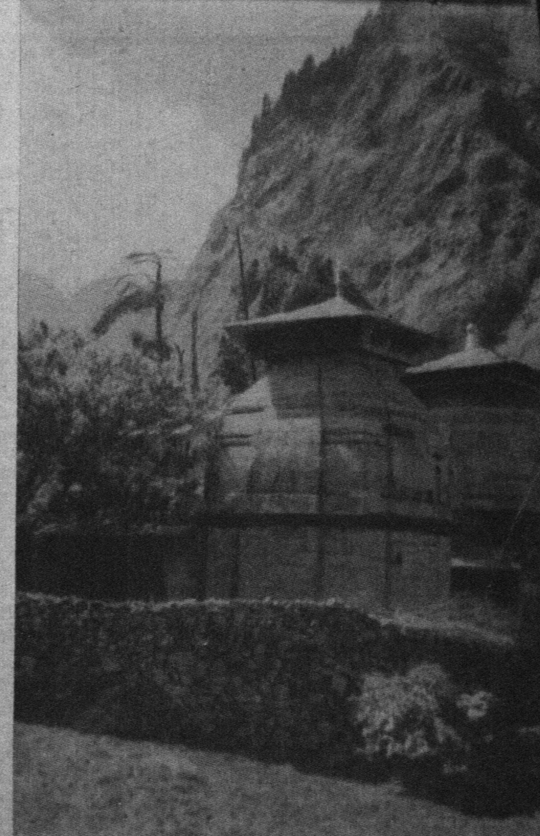
চরণরেখা



…ঞ্চপ্রয়াগ

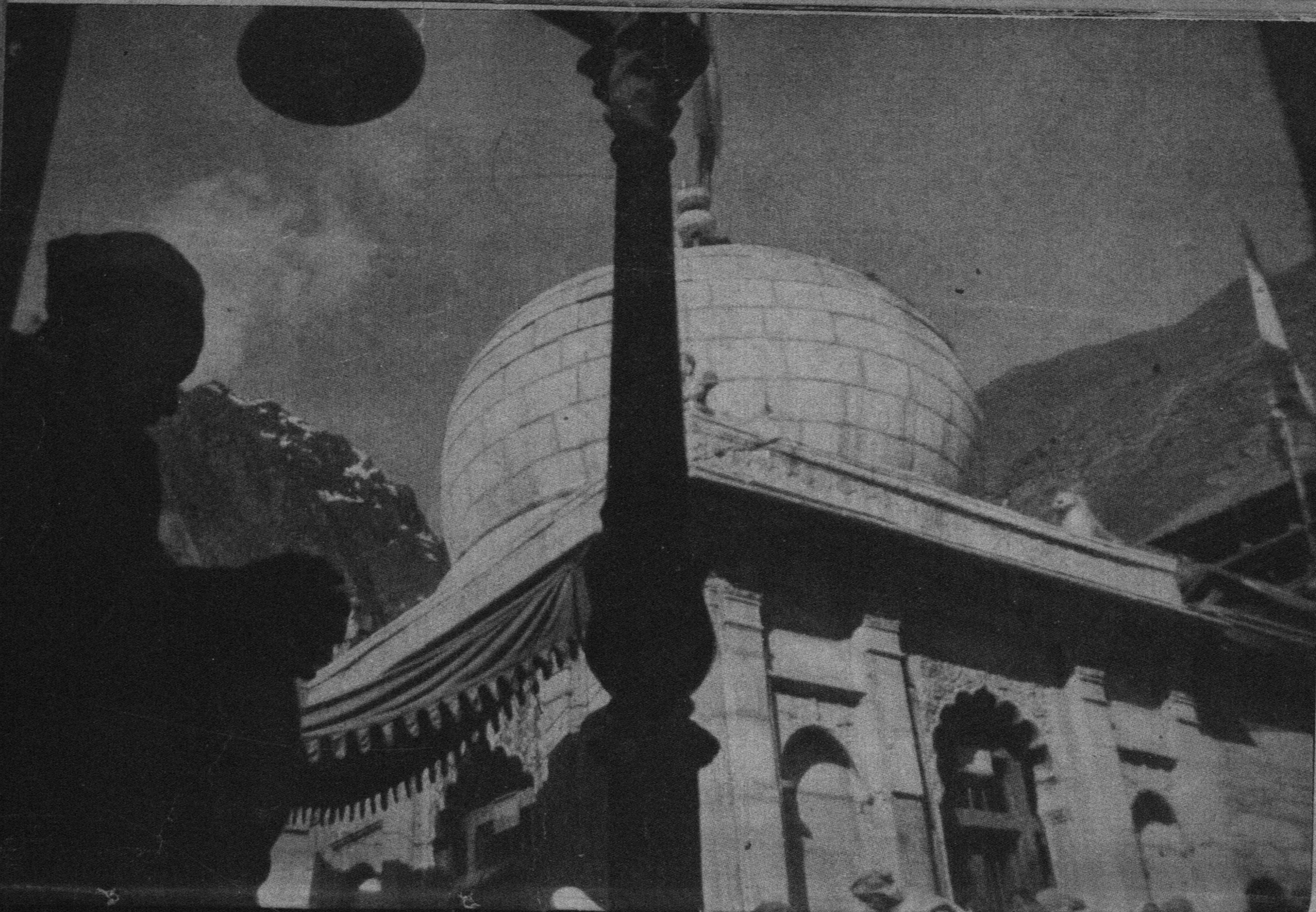
নরনারায়ণ নিকেতন—বদ্রীনাথধাম

[অসিত বসু]



যোগবদ্রী ও বাসুদেবের মন্দির—পাণ্ডুকেশ্বর

# পঞ্চ প্রয়াগ



বদ্রীনাথ মন্দির

"আমার মৃত্যুর পরে তোমরা আমার এই নশ্বর দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দিও। যদি বিদেশে কোথাও মরি, আমার দেহ সেখানে দাহ ক'রো এবং সেই ছাই পাঠিয়ে দিও প্রয়াগে।...সেই ছাই একমুঠো ছড়িয়ে দিও প্রয়াগের গঙ্গায়,...সে ভস্মরাশির এক কণিকাও সঞ্চয় করে রেখো না—ছড়িয়ে দিও নিঃশেষে।

"প্রয়াগের গঙ্গার বুকে এই যে একমুঠো চিতাভস্ম বিসর্জনের কথা বললাম তার পেছনে, অন্তত আমার তরফ থেকে কোন আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য নেই। এ ব্যাপারে আমার কোন ধর্মীয় ভাবাবেগও নেই। সুদূর শৈশবকাল থেকেই প্রয়াগের জাহ্নবী-যমুনার সঙ্গে একটি মানসিক একাত্মতা বোধ করেছি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই ভাবও বৃদ্ধি পেয়েছে।

"ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমি এই দুই স্রোতস্বিনীর রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। এবং প্রায়ই ভেবেছি, যুগ-যুগান্ত ধরে কত ঐতিহ্য, ইতিহাস আর পুরান কথা, কত গান আর গল্প, জাহ্নবী-যমুনার তীরে তীরে রচিত হয়েছে, তাদের প্রবহমাণ জলধারার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে।"

—জওহরলাল নেহরু

# দেবভূমি দেবপ্রয়াগ

দেবভূমি দেবপ্রয়াগ গিরিরাজ হিমালয়ের পঞ্চ প্রয়াগের শ্রেষ্ঠ প্রয়াগ। শ্রেষ্ঠ সে স্বর্গীয় মাহাত্ম্যে, শ্রেষ্ঠ সে স্বর্গীয় সৌন্দর্যে।

অলকানন্দা ও ভাগীরথীর মিলনভূমি দেবপ্রয়াগ—গঙ্গার জন্মভূমি দেবপ্রয়াগ। তরল-তরঙ্গিণী ভগবতী গঙ্গাবারিতে বিধৌত তীর্থ দেবপ্রয়াগ।

তাহলেও উপেক্ষিত। এখন শুধু কেদার-বদ্রী পথের একটি সাময়িক বিশ্রামকেন্দ্র। তাও যে-সব যাত্রীর হাতে সময় ও অর্থ উদ্‌বৃত্ত থাকে। অথচ দেবপ্রয়াগে শীতকালেও তেমন শীত পড়ে না। উঁচু তো মোটে ১,৫৫০ ফুট। ঋষিকেশ থেকে বাসে তো মোটে ৬৪ মাইল। বড়জোর ঘন্টা-তিনেক সময় লাগে। সারা বছর বাস চলে। বাসস্থানের সমস্যা নেই—চমৎকার ডাকবাংলো, ইন্‌স্‌পেক্‌শন-বাংলো, ধর্মশালা আর পাণ্ডাদের অগণিত যাত্রীনিবাস। রয়েছে ডাকঘর হাসপাতাল থানা ও বাজার—বাজারে খাবারের দোকান। অভাব নেই কোন কিছুর। তবু দেবপ্রয়াগ উপেক্ষিত কেন?

তবে কি আধুনিক পরিবেশ না থাকলে কেউ অবসর সময়ে সেখানে আসতে চায় না? মুসৌরী শুধু তার প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যই আমাদের আকর্ষণ করে না—আকর্ষণ করে তার চোখ-ঝলসানো জৌলুস আর উগ্র আধুনিকতার জন্য।

কিন্তু এ নিয়ম তো তীর্থের বেলায় খাটে না। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী কত কষ্ট করে প্রতিবছর কেদার-বদ্রী দর্শন করেন—পুণ্যসঞ্চয় করেন—শান্তিলাভ করেন। তবে কি এখানে শান্তি নেই, পুণ্য নেই?

আছে বৈকি। পুণ্যার্থীরা ভুলে গেছেন সে-পুণ্যকাহিনী—

······মানস-সরোবরের তীরে হিমবান পর্বত। তার হিমানী-মুকুট মাথায় পরে দাঁড়িয়ে আছে। অবশেষে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এসে থামলেন হিমবানের পাদদেশে। পথশ্রমে কাতর হলেও মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তিনি তপস্যায় বসলেন।

দেবতাদের আসন টলে উঠল। তাঁরা বিচলিত হয়ে ব্রহ্মার শরণাগত হলেন। ব্রহ্মার পরামর্শে দেবতারা কিন্নরী পুষ্পমালাকে তলব করলেন। কিন্নরী এল তার বিশ্বজয়ী রূপ আর যৌবন নিয়ে। দেবতারা তাকে আদেশ করলেন বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ করতে। কামদেব চললেন কিন্নরীর সঙ্গে। ধ্যানমগ্ন বিশ্বামিত্রের সামনে কিন্নরী নৃত্যগীত আরম্ভ করল। সমাধিস্থ বিশ্বামিত্রের অঙ্গে ক্রমাগত কাম-কুসুম-বাণ নিক্ষিপ্ত হল।

ধ্যান ভাঙল বিশ্বামিত্রের। পুষ্পমালা মোহিত হল রাজর্ষির অলৌকিক শক্তিতে। অনুতপ্ত হল তার এই অসদাচরণের জন্য সে দেবতাদের চক্রান্তের কথা প্রকাশ করে দিল।

রাজর্ষি তাকে অভিশাপ দিলেন, 'তোর সর্বনাশী রূপ ও যৌবন ধ্বংস হক। তুই মকরী হয়ে যা।'

'করুণা করুন, হে করুণাময়। কৃপা করুন, হে কৃপাসিন্ধু!' মকররূপী পুষ্পমালা রাজর্ষির কৃপাভিক্ষা করল।

করুণা হল বিশ্বামিত্রের। তিনি বললেন, 'তুমি দেবপ্রয়াগে যাও ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র যাবেন সেখানে। তিনি শাপমুক্ত করবেন তোমাকে।'

রামচন্দ্র এসেছিলেন এখানে—এই দেবপ্রয়াগে। মকররূপী পুষ্পমালা জড়িয়ে ধরেছিল তাঁর চরণযুগল। রামচন্দ্র মকরীর শিরশ্ছেদ করেছিলেন। মকরী রূপান্তরিত হয়েছিল কিন্নরীতে। কিন্নরী রামবন্দনা করে বিষ্ণুলোকে চলে গিয়েছিল।

কোন্ পথে? জানি না। বিষ্ণুলোকের সে-পথটিও বোধ করি লোকান্তরিত হয়েছে কলিযুগের আগমনে। এখন দেবপ্রয়াগ পাঁচটি

পথের সঙ্গম। দুটি মোটর-পথ—ঋষিকেশ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে জোশীমঠ এবং লছমৌলী হয়ে টিহ্ রী। তিনটি হাঁটা পথ—লছমনঝুলা, শ্রীনগর ও টিহ্ রী। যখন মোটর-পথ হয়নি তখন যাত্রীরা লছমনঝুলা থেকে চারদিন হেঁটে পৌঁছতেন এখানে—পাণ্ডা ঠিক করতেন, অন্যান্য আয়োজন সম্পূর্ণ করতেন। তারপর কেদার-বদ্রীর যাত্রীরা পাড়ি জমাতেন শ্রীনগরের পথে, আর গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর যাত্রীরা টিহ্ রীর পথে। তখন এখানে এসে যাত্রীরা দেবানুগ্রহ লাভ করতেন—সার্থক নাম ছিল দেবপ্রয়াগ। আর এখন···?

আমাকে কিন্তু এখনও আকর্ষণ করে দেবপ্রয়াগ। শুধু পুণ্য-ভূমি বলে নয়, দেবানুগ্রহের জন্য নয়, এর অপরূপ সৌন্দর্য ও অনাবিল শান্তির জন্য! সুযোগ পেলেই আমি এখানে আসি। মুসৌরী না গিয়ে দেবপ্রয়াগে আসি। এই পাহাড়ী জনপদটির দেবোপম রূপের ছটায় বাসে বসেই আমার দুচোখ জুড়িয়ে যায়। বাস থামলে নেমে পড়ি! রাস্তা থেকে নেমে আসি পুলের গোড়ায়। আড়াইশ ফুট লম্বা পুল। লছমনঝুলার মতই লোহার তারের ঝুলন্ত পুল। নীচে ভাগীরথী—অসহিষ্ণু, অশান্ত। অন্ধ আবেগে ধেয়ে চলেছে—অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হতে। সৃষ্ট হবে গঙ্গা—ভারতজননী গঙ্গা।

ভাগীরথী প্রবাহিত হবার পর থেকেই দেবপ্রয়াগ 'প্রয়াগ' হয়েছে। সৃষ্টির আগে বিষ্ণুকে তুষ্ট করতে এগারো হাজার বছর ধরে ব্রহ্মা এখানে সমাধিস্থ ছিলেন। তুষ্ট হলেন বিষ্ণু, আবির্ভূত হলেন ব্রহ্মার সম্মুখে, জানতে চাইলেন তাঁর বাসনা।

করজোড়ে ব্রহ্মা বললেন, 'প্রভু, সৃষ্টির শক্তিদান করুন আমাকে। আর এই তপস্যাভূমিকে যেন আমার সৃষ্ট মানবগণ পবিত্র তীর্থ বলে গণ্য করে।'

'তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। তুমি সৃষ্টি আরম্ভ কর। রাজা ভগীরথ স্বর্গ হতে এই পথে গঙ্গাকে মর্তে নিয়ে যাবেন। তোমার এই তপস্যাভূমি বিগলিত হবে জাহ্নবীর করুণাধারায়।'

ঝুলন্ত পুল পেরিয়েই পাথুরে পথ। ভাগীরথীর তীর ঘেঁষে পাহাড়ী পথ। চার-পাঁচজন পাশাপাশি চলতে পারে। জল কিন্তু অনেক নিচে। খাড়া পাড়। উত্তাল জলরাশি অবিরাম আছড়ে পড়ছে সেই পাড়ে। অস্বচ্ছ জল থেকে সৃষ্ট হচ্ছে ফেনা। পথের ধারে সারি সারি পাণ্ডাদের বাড়ি। সবই প্রায় দোতলা-তেতলা। সমৃদ্ধ এখানকার পাণ্ডারা। সমৃদ্ধি কিন্তু রঘুনাথজীর জন্য নয়। রঘুনাথজীর মন্দিরে এখন আর ক'জনে পুজো দেন? কেদার-বদ্রীর পাণ্ডারাই এখানে বসবাস করেন। কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণের জন্যই তাঁদের এ সমৃদ্ধি। তাহলেও ইদানীং অনেকে পাণ্ডাগিরি ছেড়ে চাকুরি নিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। এখানকার শ্রীরঘুনাথকীর্তি মহাবিদ্যালয় গাড়োয়ালের সর্বপ্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেকালের টোল একালে হায়ার-সেকেণ্ডারী স্কুল হয়েছে। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়াশুনা করে। তবে মেয়েদের জন্য একটি সংস্কৃত পাঠশালাও আছে।

আগে পাণ্ডাদের বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে ছিল ডাণ্ডি, কাণ্ডি ও ঘোড়ার দোকান। ভাগ্যবান তীর্থযাত্রীদের পরম সম্বল। আর ভাগ্যবানই বা বলি কেন? ভাগ্য নেহাত মন্দ না হলে কি আর কেউ কাঁধে চড়ে?

রাস্তা থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে। প্রায় শ খানেক সিঁড়ি পেরিয়ে অনেক উঁচুতে রঘুনাথজীর মন্দির। টিহ্‌রী-রাজ এ মন্দিরের মালিক। রাজার মৃত্যু হলে তাঁর নিজের ব্যবহৃত জিনিসপত্র এই মন্দিরে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মন্দিরের চূড়ায় শিখর-কলস, সোনার পাতে মোড়া অবিকল পদ্মকলির মত। ছত্রে আচ্ছাদিত। ছত্রের ওপরে পেতলের দণ্ড। মন্দিরের দেয়ালে নানারকম কারুকার্য—বৌদ্ধ ও দক্ষিণ-ভারতীয় ভাস্কর্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ। মন্দিরটি অক্ষত। কারণ মুসলমান আক্রমণকারীরা কোনদিন ঋষিকেশের এদিকে পদার্পণ করেনি।

মন্দিরের সামনে পেতলের তৈরি একটি গরুড়ের মূর্তি। ভেতরে

রঘুনাথজীর বিশাল মূর্তি—গা-ভর্তি গয়না, মাথায় মুকুট, কোমরে ঢাল-তরোয়াল, হাতে তীর-ধনুক। তিনি আছেন দাঁড়িয়ে আর তাঁর বাঁয়ে সিংহাসনে বসে আছেন জানকী। ডাইনে রাম-লক্ষ্মণের দুটি মূর্তি। রাম-নবমী ও বসন্ত-পঞ্চমীর সময় ঐ মূর্তি দুটিকে মন্দিরের সামনে একখানি অসম্পূর্ণ পাথরের সিংহাসনের ওপর বসান হয়। এখানে এলে শ্রীরামচন্দ্র নাকি এই সিংহাসনে বসতেন। সিংহাসনের ডাইনে মহাদেব, বদ্রীনারায়ণ ও কালভৈরব মহাবীর আর বাঁয়ে বিশ্বনাথ।

প্রবাদ আছে শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ মন্দির। আমার কিন্তু সন্দেহ হয়। কারণ শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি মন্দিরেই নাম্বুদ্রীবংশীয় পূজারী। কিন্তু এখানকার পূজারী নাম্বুদ্রীবংশীয় নয়, মারাঠী। টিহ্‌রীর রাজগুরু দেবশর্মার বংশধর এরা। দেবশর্মার নামেই দেবপ্রয়াগ।

দেবশর্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে নিয়ে এখানে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীর দেবশর্মা এখানে কঠোর তপস্যা করে-ছিলেন বহুযুগ ধরে।

অবশেষে একদিন লক্ষ্মীকে নিয়ে বিষ্ণু আবির্ভূত হলেন তাঁর সামনে। বললেন, 'তোমার তপস্যায় তুষ্ট আমি। বল, তোমার কি প্রার্থনা?'

'আপনার শ্রীচরণে আমার ভক্তি যেন চিরস্থায়ী হয়। আর আপনি চিরস্থায়ী হোন এখানে।'

'তথাস্তু। আমি আবার আসব রাম-রূপে। ততদিন আমার সুদর্শনচক্র রক্ষা করবে তোমাকে।'

'এখানকার অপর নাম সুদর্শনক্ষেত্র।

রাবণ-নিধন শেষে লক্ষ্মণ ও সীতা সহ রাম এলেন এখানে। দেবশর্মাকে বললেন, 'মুনিবর, তুমি মুক্ত। আজ থেকে তোমার এই তপস্যাক্ষেত্রের নাম হল দেবপ্রয়াগ।'

সুদর্শনচক্র সেই থেকে রক্ষা করে আসছে পুণ্যক্ষেত্রকে। ১৮৯৪ সালে এক ভয়াবহ বন্যা দেখা দিল এখানে। স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে ৭০ফুট ওপরে জল উঠল। বাড়ি-ঘর বাজার ধর্মশালা ছোট ছোট সব দেবস্থান তলিয়ে গেল। উচ্ছ্বসিত জলধারা স্পর্শ করল রঘুনাথজীর চরণযুগল। মুহূর্তমধ্যে সে উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল। অবাধ্য জলরাশি সংযত হল—ধীরে ধীরে ফিরে গেল ভাগীরথী ও অলকানন্দার কোলে। তার পরেই পাহাড়ের গায়ে উঁচু জমিতে নতুন দেবপ্রয়াগের পত্তন হল।

মন্দিরের ঠিক ওপরে একটি ছোট ধর্মশালা আছে। তার ওপরেই ক্ষেত্রপালের মন্দির। বড় ধর্মশালা এখান থেকে বেশ দূরে, অলকানন্দার ওপারে।

ক্ষেত্রপালের পুজো দিয়ে রঘুনাথজীকে দর্শন করতে হয়। ক্ষেত্র-পালের মন্দিরটি ছোট কিন্তু অবস্থানটি বড় সুন্দর। একে তো অনেক উঁচু, তা ছাড়া পাশেই একটি পাহাড়ী ঝর্ণা—শান্তা অশান্ত হলেও অখ্যাত নয়। রঘুনাথজীর জীবনের গতিপথ নির্ধারিত হয়েছিল এই শান্তারই তীরে। এখানেই মৃগভ্রমে রাজা দশরথ অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে শব্দভেদী বাণে বিদ্ধ করেন। কৃত্তিবাস বলেছেন—সরোবর, পাণ্ডারা বলছেন—নির্ঝর। কোনটি সত্য জানেন রাজা দশরথ।

তাই বলে ক্ষেত্রপালের মন্দির কিন্তু সবচেয়ে উঁচু নয়। ওর ওপরে সাধারণতঃ কেউ যায় না, এই যা। মন্দিরের ওপরেই জঙ্গল শুরু। জঙ্গল চিরে বাস-রাস্তা। ওপারের রাস্তা আরও মাইলখানেক এগিয়ে ভাগীরথী পেরিয়ে এপারে এসেছে। তাহলেও দেবপ্রয়াগের যাত্রীরা ওপারেই নামেন। সেইটেই সহজ। এই খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে আসা খুবই কঠিন।

বাস-রাস্তার ওপরে জঙ্গল আরও জটিল হয়েছে। একেবারে পাহাড়ী জঙ্গল—ঘন পাইন-বন। ঐ জঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে আরেকটি মন্দির—কালীমন্দির। সারা গাড়োয়াল জুড়ে কেবল শিবেরই

জয়গান। ব্রহ্মা-বিষ্ণু যা হোক কিছুটা পাত পেয়েছেন। কিন্তু মা-কালীর তেমন নামডাক নেই। যদিও তিনি শিবানী, হিমালয়দুহিতা পার্বতী তবু তিনি কলকাত্তাওয়ালী। নিরাভরণা শ্মশানচারিণী অসুর-দলনী শক্তি-রূপিণী মহামায়া মহাকালী। বাঙালীর পরমারাধ্যা।

সেদিক থেকে এ মন্দিরের বিশেষত্ব আছে। বিশেষ করে পরিবেশটি। কালীমন্দিরের পক্ষে নিখুঁত। মন্দিরটি ছোট কিন্তু ঘণ্টাটি বেশ বড়। নির্জন নিশীথে ঐ ঘণ্টাধ্বনি, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে সমগ্র দেবপ্রয়াগকে চমকিত করে তোলে।

রঘুনাথজীর মন্দির থেকে নেমে এলেই সূর্যতীর্থ—ছোট একটি কুণ্ড। ওখানে স্নান করলে নাকি কুষ্ঠরোগ সেরে যায়। মাঘের শুক্লা সপ্তমীতে স্নান করলে তো কথাই নেই—সূর্যালোকে নিশ্চিত ঠাঁই, আর পরজন্মে অবশ্যই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে বেদ-বেদান্তে মহাপণ্ডিত হবেন। মেঘাতিথি নামে এক ব্রাহ্মণ এইখানে তপস্যা করে সূর্যকে তুষ্ট করেছিলেন।

সূর্যতীর্থ ছাড়িয়ে আরেকটু নামলেই বেতাল-কুণ্ড। পাশেই বেতাল-শিলা। ওই কুণ্ডে স্নান সেরে এই শিলা স্পর্শ করে, নারায়ণের ধ্যান ও দান করতে হয়। করলে সর্বতীর্থ, সর্বযজ্ঞের ফল লাভ হয়। পিণ্ড দিলে তো একবারে কোটিগুণ ফল।

শান্তা এসে মিলেছে ভাগীরথীতে। শান্তার সঙ্গমে শিবতীর্থ। শ্রীরামচন্দ্র নাকি অনেক শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেছিলেন এখানে। বিশ্বেশ্বর শিব হল তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই শিব দর্শন না করলে তীর্থযাত্রা বিফল হয়।

শিবতীর্থ পেরিয়েই ভাগীরথী-অলকানন্দা সঙ্গম। উদ্দাম আবিল ভাগীরথীর ধারা অলকানন্দার শান্ত সুনীল জলধারায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। বামন অবতার যখন তিন পায়ে ত্রিভুবন অবরোধ করছিলেন তখন তাঁর পায়ের নখ থেকে নিঃসৃত হল এক জলধারা। সেই ধারা ধ্রুবমণ্ডল ও সপ্তর্ষিমণ্ডল হয়ে ব্রহ্মলোকে

মেরুশৃঙ্গে পতিত হল। বিভক্ত হল চার ধারায়—সীতা, ভদ্রী, চক্ষু ও অলকানন্দা। সীতা অবতীর্ণ হলেন গন্ধমাদনের শিখরে, ভদ্রী, গেলেন পূবে—ভদ্রাশ্ববর্ষে, চক্ষু মাল্যবানের চূড়া থেকে নেমে গেলেন পশ্চিমে—কেতুমাল পর্বতের দিকে। আর অলকানন্দা এলেন দক্ষিণে—গিরিরাজ হিমালয়ে। শিব তাঁকে ধারণ করলেন জটাময় মস্তকে। শিবকে প্রসন্ন করলেন ভগীরথ। গঙ্গাকে নিয়ে চললেন মর্তলোকে। পথে গঙ্গাধারা দ্বিধাবিভক্ত হল। সেই দুই ধারার পুনর্মিলন হল এখানে—এই দেবপ্রয়াগে।

অনেকখানি পাথর-বাঁধানো জায়গা। দুই প্রান্তে দুইসারি সিঁড়ি। রাস্তা থেকে নেমে এসেছে ভাগীরথী ও সঙ্গমের জলে। জল যদিও সময় সময় সিঁড়ির শেষ ধাপেরও নিচে থাকে। তবে শেকল বাঁধা আছে। তাই ধরে যাত্রীরা হাঁটু-জলে নেমে স্নান সমাধা করেন।

বাঁধানো জায়গাটা তিন স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর একটি বিশাল চত্বর—একদিকে ছোট একটি টিনের চালা, আর একদিকে সাত-খিলানওয়ালা একটি বারান্দা—মেয়েদের বিশ্রমের জায়গা। সাত ধাপ সিঁড়ি ভেঙে দ্বিতীয় স্তরে নামতে হয়। আয়তনে ছোট হলেও, প্রয়োজনে হেয় নয়। পিণ্ড দেবার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। অনেকেই গয়ার বদলে এখানে পিণ্ড দেন। গয়াতে আছে বিষ্ণুর পা, আর এখানে নাভি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, দেবপ্রয়াগে কাক নেই। তীর্থে কাক নেই? লোকে বলে, রানীর অভিশাপ। তাকে সতী হতে দেয়া হয় নি। স্বামীর সঙ্গে মরতে না পেরে তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'কাকেও ছোঁবে না এখানকার পিণ্ড।'

নরসুন্দররা লাইন করে বসে আছে। পাইকারী হারে মস্তক মুণ্ডন চলেছে। কিছু বলার দরকার নেই। সামনে গিয়ে বসে পড়লেই হল। পাঁচ মিনিটে কেশ-মুক্ত। মুণ্ডনের পর পিণ্ডদান।

পুজোপার্বণ ও যাগযজ্ঞ চলেছে। ছোট ছোট দল, পৃথক পৃথক

পাণ্ডা। সংকল্পের সময় অমনোযোগী হলে, উপায় নেই। যা বলে ফেলবেন তাই দিতে হবে। অনেকে কিন্তু পাণ্ডার সাহায্য ছাড়াই পিণ্ড দিচ্ছেন। এখানে চাল-কলার বদলে পিণ্ড দিতে হয় আটার গুলি দিয়ে। আটার গুলি কিনতে পাওয়া যায়। ষোলটি গুলি কিনে, মন্ত্র পড়ে জলে ফেলে দিলেই পিণ্ডদান হয়ে গেল। জলে ভেসে আছে অসংখ্য মহাশোল—ভেসে আছে দুর্বার স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে। মহানন্দে মহাশোল পিণ্ড গ্রহণ করছে। শান্তিলাভ করছেন পূর্বপুরুষ, তৃপ্তিলাভ করছেন উত্তরপুরুষ, পরমায়ু লাভ করছে মহাশোল।

ঘাটের তৃতীয় স্তরটি আয়তনে দ্বিতীয় স্তরের কাছাকাছি, কিন্তু গুরুত্ব কম। তিথি বা যোগ না পড়লে এখানে ভিড় জমে না। আমার মত অযোগ্য উত্তরপুরুষ যারা, তারাই শুধু এখানে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে জলের উচ্ছ্বাস, যাত্রীদের উচ্ছ্বাস আর মহাশোলের উচ্ছ্বাস।

এ ঘাট আগে এমন সুন্দর ছিল না, এমন নিরাপদ ছিল না—ছিল একটি মরণ-ফাঁদ। পিতৃপুরুষকে পিণ্ড দিতে এসে অনেকেই সপিণ্ড পিতৃপুরুষের কাছে চলে যেতেন। ১৯৪১ সালে পোরবন্দরের শেঠ নানজীভাই কালিদাস মেহ্তা তিনলক্ষ টাকা খরচ করে এই অপরূপ ঘাটটি তৈরি করে দেন। ১৯৫৩ সালে তিনি আবার এসেছিলেন এখানে। সেবারেও পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসটি তৈরি করে গেছেন। শেঠজীকে এই উন্নয়নে উৎসাহিত করেছিলেন একজন স্থানীয় সমাজসেবী—শ্রীরামপ্রসাদ গিরিজাশঙ্কর কোটিয়াল। শেঠজীর সঙ্গে তাঁকেও জানাই আমার প্রণাম।

সঙ্গমের ভাগীরথীর অংশ বশিষ্ঠ-কুণ্ড নামে খ্যাত। প্রকাণ্ড একখানি পাথর পড়ে আছে একপাশে—মাঝখানে একটি গর্ত। ওটি নাকি যজ্ঞকুণ্ড। ঐ কুণ্ডে বশিষ্ঠদেবের পৌরোহিত্যে ইন্দ্র যজ্ঞ করেছিলেন।

অলকানন্দার অংশকে বলে ব্রহ্মকুণ্ড। এখান থেকে আশিহাত উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে রয়েছে দ্বাদশতীর্থ—দ্বাদশশিলা। সত্যযুগে সর্ববন্ধু নামে এক ব্রাহ্মণ দ্বাদশ-বিষ্ণুকে তুষ্ট করেছিলেন। শিলারূপী বিষ্ণুকে গঙ্গা থেকে তুলে এনে স্থাপিত করেছেন ওখানে।

দ্বাদশ তীর্থের কাছে দুটি গুহা আছে। তার ছোটটিতে রয়েছে মহাদেবের মূর্তি।

আরও অনেক তীর্থ আছে এখানে—পৌষ্পমাল তীর্থ, ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্বতীর্থ, আদ্য বিশ্বেশ্বর, তুণ্ডেশ্বর, গঙ্গা যমুনা ও ভরত মন্দির। এখানকার রামভক্তরা সবার মত ভরতকে ভুলে যান নি।

সঙ্গম ঘাটে দাঁড়ালে তিনটি টিলা দেখা যায়—গৃধ্রাচল, নৃসিংহাচল ও দশরথাচল। শেষেরটি থেকে সৃষ্ট হয়েছে শান্তা—রামায়ণের উৎস।

ওপারে গঙ্গার দুই তীরে দেখা যায় দুটি পথ—আঁকাবাঁকা, উঁচুনিচু। একটিতে মানুষ চলে বাসে, আর একটিতে পায়ে হেঁটে। একটি আধুনিক, আর একটি পৌরাণিক। একটি আমার আমলের, আর একটি মান্ধাতার আমলের।

পথ আলাদা কিন্তু লক্ষ্য এক। যুগের প্রভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। দুটিই মহাপ্রস্থানের পথ। খানিক দূরে গঙ্গা গেছে বেঁকে। বাঁকের মুখে দুটি পথ একসঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে।

আমার পথ আলাদা। আমি আজ মহাপ্রস্থানের পথিক নই। সঙ্গম পেরিয়ে আমার পথটিও গেছে বেঁকে—একেবারে নব্বুই ডিগ্রী কোণ করে। এতক্ষণ এসেছি ভাগীরথীর তীর ধরে, এবারে চলেছি অলকানন্দার তীরে তীরে। পথ সঙ্কীর্ণ হয়েছে তবে সৌন্দর্য বেড়েছে। আগের চেয়ে একটু চড়াই। খুব খাড়া পাড়। জল অনেক নিচে। পড়ে যাবার ভয় নেই। প্রায় কোমর-সমান পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। জলের শব্দ কমেছে। অলকানন্দা ভাগীরথীর চেয়ে শান্ত। বাঁয়ে তেমনি দোতলা-তেতলা বাড়ি। এমন একখানি বাসা পেলে,

অনেকেই কাম ক্রোধ মোহ বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাসী হতে আপত্তি করবেন না।

এর পরই কিছুটা যায়গা জুড়ে কোন লোকালয় নেই। এখানে পাহাড়টা সহসা একেবারে খাড়া হয়ে ওপরে উঠে গেছে। কোন রকমে পাহাড় কেটে রাস্তা করা হয়েছে, কিন্তু বাড়ি তৈরি সম্ভব নয় এখানে। তাই বলে দেবপ্রয়াগ শেষ হয়ে যায় নি। বাড়ি-ঘর রয়েছে বইকি। এই এলাকাটুকু পেরোলেই দেবপ্রয়াগের দ্বিতীয় অংশ—অপেক্ষাকৃত নির্জন। এ যেন শহরতলি। ডাকবাংলো ও ইন্‌স্‌পেক্‌শন বাংলো কিন্তু এদিকেই। তবে অনেক উঁচুতে—বাস-রাস্তার ধারে। তুটোরই অবস্থান ভারী সুন্দর। বারান্দায় দাঁড়ালে বহুদূর অবধি দেখা যায়।

আমি কিন্তু এখানে থামব না—উঠব না ডাকবাংলোয়। আমি যাব অলকানন্দার ওপারে। না, এই ঝুলার ওপর দিয়ে নয়। এ তো লছমনঝুলার পথ। আমি যাব আরও এগিয়ে, যাব এই শহরতলি ছাড়িয়ে। ওখানে অলকানন্দার ওপরে আরেকটি ঝুলা আছে। ওপারেও কিছু বাড়ি-ঘর আছে, ক্ষেতখামার আছে। আছে বাজার, আর আমার মত হাজার হাজার যাত্রীর নিশ্চিন্ত আশ্রয়—কালি-কমলীর ধর্মশালা।

ঝুলা পেরিয়েই বাজার। দোকানীরা তরি-তরকারির টুকরি নিয়ে পথের তু-ধারে সকাল-সন্ধ্যায় সারি বেঁধে বসে। এ ছাড়া রয়েছে মুদিখানা ও খাবারের দোকান। ফরমাশ দিলেই ধর্মশালায় খাবার পাঠিয়ে দেয়—অবিশ্যি নিরামিষ। এখানে আমিষ অচল। রাস্তাটি ধর্মশালায় এসে শেষ হয়েছে। লোকালয়েরও শেষ। এর পরে সবুজের সমারোহ। জঙ্গল আর তার মাঝে ধাপে ধাপে ক্ষেত—বজরা, ভুট্টা, আলু ও ধানের ক্ষেত।

চৌকিদার আমাকে চিনতে পেরেছে কি? কত লোকই তো বার বার এখানে আসে। সবাইকে কি সে মনে রাখতে পারে? সে

আমাকে সেলাম করল, কুশল জিজ্ঞেস করল, কুলিকে মালপত্র নামাতে সাহায্য করল। বকশিশের লোভে কি? বকশিশ যে দেবই তার নিশ্চয়তা কোথায়? এরা দেবজ্ঞানে যাত্রীদের সেবা করে—বকশিশের লোভে নয়, পেশার প্রয়োজনে নয়, অন্তরের তাগিদে। ট্যাঁকের ওজনে মানুষের ওজন হয় না এখানে। কড়ি দিয়ে অনেক কিছুই কিনতে হয় না দেবপ্রয়াগে।

তাই টাকা-পয়সার ফিকির থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পেতে আমি এখানে আসি। ট্রাম-বাসের গুঁতোগুঁতি থেকে রেহাই পেতে আমি এখানে আসি। কারখানার বাঁশী আর আধুনিকতার ফাঁসি থেকে মুক্তি পেতে আমি এখানে আসি। আসি এই কালিকমলীর ধর্মশালায়, ঠাঁই নিই দোতলার একখানি ঘরে।

দুখানি দোতলা বাড়ি নিয়ে কালিকমলীর ধর্মশালা। রাস্তার দিকেরটি পুরনো। এরই নিচের তলায় সদাব্রত ও ধর্মশালার অফিস। সাধুসন্ন্যাসী ও দরিদ্র যাত্রীরা বিনামূল্যে সিধা পান। আমাদের মত যাত্রীদের জন্য কোন সিধার ব্যবস্থা নেই। এখানে সব উল্‌টো নিয়ম। কোথায় তেলো মাথায় তেল দেবে—তা নয়, যত সব···

নতুন অংশটি অলকানন্দার ধারে। সামনের দিক থেকে মনে হয় একতলা। নদীর দিকে এলে বোঝা যায় দোতলা। দেবপ্রয়াগকে দেখতে হলে, আসতে হবে এই দোতলায়—দাঁড়াতে হবে বারান্দায়।

সামনেই অলকানন্দা—নৃত্যের তালে তালে বয়ে চলেছে। কোন অদৃশ্যলোক হতে হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে এখানে, চলেছে ভাগীরথী-সঙ্গমে, একেবারে ধর্মশালার পাশ দিয়ে। সঙ্গম যদিও দেখা যায় না এখান থেকে। যা দেখা যায় না তার জন্য আফসোস করে কি লাভ? যা দেখতে পাচ্ছি তাই তো পরম পাওয়া। চাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি। সুন্দরকে দেখতে এসে অনন্তকে প্রত্যক্ষ করা।

চারিদিকে পাইনের সারি। পাইন আর পাহাড়। একটি নয়, দুটি নয়—অসংখ্য পাহাড়। পাহাড় আর পাহাড়ের ঢেউ। সামনেরটা

সবচেয়ে নিচু, পরেরটা তার চেয়ে উঁচু, তারপরে আরও—আরও উঁচু। শেষেরটি আকাশ ছুঁয়েছে। আকাশের পরে কী?

ঐ পাহাড় আর এই অলকানন্দা—মন্দাকিনী, নন্দাকিনী, বিষ্ণুগঙ্গা ও কর্ণগঙ্গার মিলিত ধারা। বদ্রীনারায়ণকে দর্শন করে অলকাপুরীর করুণাবারি নিয়ে যোলো-কলা চলেছে মর্তলোকে।

গঙ্গার পনেরো কলা চলল রাজা ভগীরথের সঙ্গে। যোলো-কলা কিন্তু দুষ্টুমি করে পালিয়ে গেল অন্য পথে—গেল অলকাপুরীতে বদ্রীনারায়ণকে দর্শন করতে। নির্দয় কুবের তাকে বন্দী করে রেখে দিলেন। এদিকে ভাগীরথী এল দেবপ্রয়াগে। ততক্ষণে দেবতাদের ভিড় জমে উঠেছে। ভাগীরথীকে দেখে তাঁদের সে কী উল্লাস! তাঁরা অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করলেন ভগীরথকে। তারপর নেমে পড়লেন জলে। কিন্তু ডুব দিয়েই টের পেলেন। বললেন, 'এ তো অসম্পূর্ণ গঙ্গা মহারাজ! যোলো-কলা গেল কোথায়?'

ব্যাপারটা জানতে পেরে ভগীরথ তো রেগেই আগুন। তিনি কুবেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন শুরু করে দিলেন। প্রমাদ গণলেন দেবতারা। তাঁরা কুবেরের পিতামাতাকে পাঠালেন কুবেরের কাছে। সুবুদ্ধি হল তাঁর। মুক্তি পেল যোলো-কলা।

অলকাপুরীতে বদ্রীনারায়ণকে দর্শন করে অলকানন্দা এল দেবপ্রয়াগে। গভীর অনুরাগে জড়িয়ে ধরল ভাগীরথীকে। শান্ত হলেন ভগীরথ। শান্তির নিশ্বাস ফেললেন দেবকুল। তাঁরা তখন ভগীরথের পিতৃপুরুষের পিণ্ড দিলেন ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমে—গঙ্গার জন্মভূমি এই দেবভূমি দেবপ্রয়াগে।

# রুদ্রপ্রধান রুদ্রপ্রয়াগ

"সাব্ শের।"

'কিধর ?

'...খাড়ি কা উস্‌পার্। বাবা রুদ্রনাথ কি লীলা। ম্যায় দেখা মগর ওহ্ নেহী দেখা।'

"চাচা তখনও হাঁপাচ্ছে। সাহেব তাকে বসতে বললেন। খাড়িটা খুব দূরে নয়। তাঁবুর সামনেই পাকদণ্ডী। কিছুটা গিয়েই বাঁ দিকে বেঁকে অলকানন্দার কাছে নেমে গেছে। বাঁকের মুখে একটা টিলা। এদিক থেকে টিলার ওদিকটা দেখা যায় না। সত্যি যদি বাঘটা ঘাপটি মেরে ওপাশে বসে থাকে, তাকে ঘায়েল করা অসম্ভব। সাহেব কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এসেছেই যখন, আমাকেই গিয়ে অভ্যর্থনা করতে হয়, কি বল ?'

"তিনি রাইফেলটা তুললেন, বেল্ট বাঁধলেন। অগত্যা আমাকেও পিছু নিতে হল। চাচাও চলল আমাদের সঙ্গে। তাঁর তখন হাঁপানির বদলে কাঁপুনি শুরু হয়েছে—উত্তেজনার বদলে আফসোস। কেন সে এসে বলতে গেল বাঘের কথা ? সাহেব তো বাঘের লোভেই ঘর-বাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছেন।

"কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা এসে দাঁড়ালাম সেই টিলার সামনে। হয়তো বা এরই কাছাকাছি কোথাও, কিন্তু আজ আর চেনার উপায় নেই। সেদিনের পাকদণ্ডী আজকের এই সুপ্রশস্ত বাস রাস্তা। ডিনামাইট ফাটিয়ে যতটা সম্ভব চওড়া করা হয়েছে। বসেছে বাজার, তৈরি হয়েছে এই ডাকবাংলো। তখন এখানে ছিল ঘন জঙ্গল। জঙ্গল বলতে বড় বড় কাঁটা ঝোপ আর কিছু পাইনের গাছ। পাইন গাছ খুব বেশী বড় হতে পারে না এখানে। রুক্ষ প্রকৃতি—মাটি কম, পাথর বেশি।

"পাকদণ্ডীটা গিয়ে শেষ হয়েছিল অলকানন্দার গায়ে। এখন যেখানে লোহার পুল, সেখানে ছিল দড়ির ঝুলা। ঝুলার কাছেই সেই টিলা। চারিদিকে বুনো ঝোপ। ঝোপের আড়ালে ব্যাঘ্রপ্রবর যদি ওৎ পেতে বসে থাকে? সাহেবও অবস্থাটা চিন্তা করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় দেখেছ?'

'জী ঐ টিলার ওপারে।'

'বেশ, তুমি এগিয়ে যাও। আমি আসছি পেছনে।'

'হুজুর! আমার পরিবার ও বুড়ী মাকে দেখার আর কেউ নেই।'

'তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে যাও।'

'হুজুর মা-বাপ?'

'যাবে না?'

'হুজুর!'

'তাহলে আমি তোকেই গুলি করব।' সাহেব বন্দুক তুললেন। বিস্মিত হলেও চুপ করে থাকি। অগত্যা চাচা ছুটতে থাকে টিলার দিকে। সাহেবও পা চালালেন। আমি সাহেবকে অনুসরণ করি।

"একটা ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জনে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। দুপাশের পাহাড় থর থর করে কেঁপে উঠল। আর্তনাদ করে উঠল চাচা। বাঘটা ঝাঁপ দিয়েছে তার ওপরে। গর্জে উঠল সাহেবের বন্দুক। আর্তনাদ করে বাঘটা পড়ে গেল পথের ওপরে—ঠিক চাচার পায়ের সামনে। বাঘটার করুণ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। কিন্তু সে কম্পন ক্ষণস্থায়ী। আস্তে আস্তে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ল, স্থির হয়ে গেল।"

থামলেন সিংজী। আমি বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলাম। বিকেলের লাল রোদটুকু কখন সামনের ঐ পাহাড়টার পেছনে পালিয়ে গেছে টের পাইনি। চৌকিদারকে লণ্ঠন নিয়ে আসতে দেখে আমাদের খেয়াল হল সন্ধ্যা হয়েছে। আবছা আঁধার এসে গেছে এই ডাকবাংলোর বারান্দায়। অলকানন্দার ওপারের পাহাড়গুলো

অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কালো পাহাড় মিশে যাচ্ছে কালো আঁধারে। আঁধারের আগমনে এক সময় বাঘের রাজত্ব শুরু হত রুদ্রপ্রয়াগে। বিখ্যাত শিকারী জিম করবেট্ অনেকদিন ছিলেন এ অঞ্চলে। 'দি ম্যানইটিং লেপার্ড অভ্ রুদ্রপ্রয়াগ' গ্রন্থে তিনি সে-সব দিনের কথা লিখে গেছেন।

মাইল দুয়েক আগে আমরা গোলাবরায় নামে একটা গ্রাম পেরিয়ে এসেছি। দেখে এসেছি সেই আম গাছ, যে গাছে বসে জিম করবেট্ ১৯২৫ সালে রুদ্রপ্রয়াগের সেই চিতাবাঘটাকে গুলি করে মেরেছিলেন। অগস্ত্যমুনি থেকে কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত ছিল সেই মানুষ-খেকো চিতার এলাকা। ১৯১৮ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভীষিকার রাজত্ব চালিয়ে কম করেও সোয়াশ লোককে হত্যা করেছিল। সন্ধ্যার পর ভয়ে কেউ ঘরের বাইরে বের হত না। অমানুষিক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে অসীম সাহসী জিম করবেট্ স্থানীয় বাসিন্দাদের সেই নরখাদকের কবলমুক্ত করেন। আজও তাঁকে এ অঞ্চলে দেবজ্ঞানে ভক্তি করা হয়। তাঁর নামে প্রতি বছর রুদ্রপ্রয়াগে মেলা বসে।

বাঘের উৎপাত তখন লেগেই থাকত। প্রায়ই গরু-ভেড়া মারা পড়ত। মাঝে মাঝে মানুষও। খবর পেয়ে সাহেবরা আসতেন। বন্দুক হাতে রাতের পর রাত পাহাড়ে জঙ্গলে কাটিয়ে দিতেন। তাঁদের কথাই বলছিলেন বুধন সিং—স্থানীয় অধিবাসী। সাহেবদের সঙ্গে থেকে মোটামুটি ইংরেজী বলতে পারেন। শুনতে ভালই লাগছিল। সিংজীকেও ভাল লাগে সকলের। স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ, অমায়িক ও ভদ্র। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। শিকারী সাহেবরা রুদ্রপ্রয়াগে এলেই তিনি তাঁদের সঙ্গ নিতেন। তারপর এক সময় রুদ্রপ্রয়াগে বাঘের উৎপাত কমল। বাস রাস্তা হল, বাজার বসল, এই ডাকবাংলো তৈরি হল। সাহেবরা তাঁকেই করলেন ডাকবাংলোর কেয়ার-টেকার।

মনের মত চাকরি কজন পায় এ সংসারে। সিংজী কিন্তু সুখী

সেদিক থেকে। তিনি নিরলসভাবে ডাকবাংলোর দেখাশুনা করেন। যথাসাধ্য যাত্রীদের সেবা করেন—অযাচিতভাবে। যাত্রীর তুলনায় এখানে বাসস্থান অল্প। ডাকবাংলো খুবই ছোট। প্রায়ই বোঝাই হয়ে থাকে সরকারী কেউ-কেটা আর আমার মত সরকারী চিট্‌ঠি-ওয়ালা ভবঘুরেদের ভিড়ে।

যাত্রীদের ঠাঁই বলতে তো এপারে মন্দির কমিটির রেস্ট হাউস আর ওপারে অলকানন্দার লোহার পুল পেরিয়ে কালীকমলীর ধর্মশালা। সব সময় সেখানেও ঠাঁই মেলে না। দোকানীদের করুণাপ্রার্থী হতে হয়। অর্থের বিনিময়ে যদি রাতের আশ্রয় মেলে। না মিললে, সিংজী তাদের পরামর্শ দেন আরও আড়াই মাইল হেঁটে যেতে—কোটেশ্বরে। সেখানে একটি গুহায় শিবলিঙ্গ আছে—কোটেশ্বর মহাদেব। সর্বদা জল পড়ছে শিবের মাথায়—দেরাদুনের টপকেশ্বরের মত। আর আছে অলকানন্দার তীরে সুন্দর ছোট একটি ধর্মশালা। রুক্ষ পাহাড়ী প্রকৃতির মাঝে মানুষের একমাত্র সৃষ্টি।

রুদ্রের প্রভাবেই রুদ্রপ্রয়াগের প্রকৃতি রুক্ষ হয়েছে। কিন্তু সে নিষ্ঠুর নয়। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দুহাজার ফুট উঁচু এই পাহাড়ী জনপদে কখনই তুষারপাত হয় না, ধস নামে না, বান ডাকে না। কোটেশ্বরের ধর্মশালাটিকে প্রকৃতি লালন-পালন করছেন পরম যত্নে। দিনের আলো থাকতেই যাত্রীরা চলে যান কোটেশ্বর। ওখানে আশ্রয়ের অভাব হয় না। কজনই বা একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এই আড়াই মাইল পাহাড়ী পথ ভাঙতে রাজী হন।

পাহাড়ী পথ হলেও কষ্টের পথ নয়। পাহাড় আর পাহাড়ী গাছের ছায়ায় ছাওয়া প্রায় সমতল পথ। অলকানন্দার তীরে তীরে সংকীর্ণ সুন্দর পথ। চলতে ভালই লাগে। ভাল লাগে ধর্মশালাটি। নির্জনতার নিজস্ব একটা স্বাদ আছে। যাঁরা সে স্বাদ একবার পেয়েছেন তাঁরা এই আড়াই মাইল পথকে তুচ্ছজ্ঞান করেন।

বিদায় নিলেন সিংজী। অনেকটা পথ যেতে হবে তাঁকে। ২১৪

ফুট দীর্ঘ অলকানন্দার পুল পেরিয়ে, সঙ্গম ছাড়িয়ে, পৌঁছতে হবে মন্দাকিনীর তীরে। পেরোতে হবে নতুন পুল, যেখানে কিছুদিন আগেও ছিল দড়ির ঝুলা। বিজ্ঞান উন্নত করে, সমৃদ্ধি আনে, কিন্তু বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে, অতীতকে মুছে ফেলে। দড়ির ঝুলা অপসৃত হচ্ছে গাড়োয়াল থেকে। লক্ষ্মণের ঝুলা আজ আর নেই লছমন-ঝুলায়।

এখানে কিন্তু কিছুদিন আগেও ছিল সেই সাবেকী ঝুলা। গাছের ছালের দড়ি আর পাহাড়ী বাঁশের তৈরি দোদুল্যমান ঝুলা। পা দিলেই সবটা একসঙ্গে দুলে ওঠত। মনে হত এই ঝুঝি ছিঁড়ে পড়ল। নিচে মন্দাকিনী—মন্দাক্রান্তা নয়, মাতঙ্গিনী। উন্মত্ত আবেগে ছুটে চলেছে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হতে। ঝুলা ছিঁড়লে মরণ অবধারিত। তবে কখনই ছিঁড়ে যেত না। অভ্যেস না থাকলে পেরোতে ভয় লাগত, এই যা। এ ঝুলার প্রয়োজন কিন্তু কম ছিল না। মন্দাকিনীর ওপারে গ্রাম আছে। সিংজী সেই গ্রামেরই বাসিন্দা। সে গাঁয়ের আরও অনেককে সিংজীর মত দুবেলা আসতে হত ঝুলা পেরিয়ে। যে সব যাত্রীরা শুধু পুণ্যার্জন করতেই পদার্পণ করেন এই পুণ্যভূমিতে, তাঁদের কথা আলাদা। তাঁদের কোন কাজেই আসত না এ ঝুলা। কিন্তু যাঁরা চোখ দুটির আবেদনে একবারে নীরব থাকতে পারেন না, তাঁদের এই ঝুলা পেরিয়ে যেতে হত ওপারে। রুদ্রপ্রয়াগের প্রকৃত রূপ দেখতে হলে ওপারে যেতেই হবে।

কেদারনাথের মন্দাকিনী এসেছে এখানে। বিলীন হয়েছে বদ্রীনাথের অলকানন্দায়। স্ফটিক স্বচ্ছ মন্দাকিনী মিলেছে চন্দন-বর্ণা অলকানন্দায়। মন্দাকিনী সংকীর্ণ ও শান্ত, অলকানন্দা প্রশস্ত ও অশান্ত। দুয়ে মিলে প্রশস্ততর হয়েছে, কিন্তু মন্দাকিনী নাম গেছে মুছে।

পরম পুণ্যক্ষেত্র এই অলকানন্দা ও মন্দাকিনী সঙ্গম। কথিত আছে—গয়রাজার যজ্ঞে অসন্তুষ্ট পরশুরামের শাপে যে দুলক্ষ ব্রাহ্মণ

ব্রহ্মরাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁরা এই সঙ্গমের পুণ্যসলিলে স্নান করে শাপমুক্ত হন।

সঙ্গম ঘাটটি বেশ সুন্দর ও নিরাপদ। একশ চল্লিশ ধাপ সিঁড়ি—দুধারে দেয়াল ঘেরা। স্বামী সচ্চিদানন্দের অনুরোধ কলকাতার রায়বাহাদুর হাজারীমল দুধওয়ালা এই ঘাট নির্মাণের ব্যয় বহন করেছেন।

সঙ্গমকে বলে সূর্যপ্রয়াগ। দেবর্ষি নারদের তপস্যাক্ষেত্র। ঘাট একটা আছে। যথারীতি শেকলও বাঁধা আছে। তবে জলে নেমে স্নান করার সাধ্য নেই কারও। ভয়ঙ্কর স্রোত। ঘাটে বসে ঘটি ভরে স্নান করেন সবাই। একটু অসাবধান হলেই ঘটি খোয়াতে হবে।

ঘাট থেকে খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে রুদ্রনাথের মন্দিরে। ছোট-খাটো ঝকঝকে মন্দিরটি। ভারী সুন্দর। চারিদিকে ঘোরানো ছকোণা বারান্দা। মাঝখানে মন্দির। গম্বুজটি মোচার মত। ওপরে ছত্র ও দণ্ড। মন্দিরে আছে শিবলিঙ্গ আর জগমোহন—দুটি ছোট ছোট কুঠরি। একটিতে নারদেশ্বর শিব, আরেকটিতে কামেশ্বর শিব।

সিঁড়ি কিন্তু শেষ হয় নি মন্দিরে। উঠে গেছে আরও ওপরে, পাহাড়ের গা বেয়ে, দেবী অন্নপূর্ণার মন্দিবের পাশ দিয়ে। কৃপাহীনা অন্নপূর্ণা। সেবা নেবার বেলায় ষোল আনা, কিন্তু কৃপা করেন না সেবায়েতদের। চাষের জমি এখানে খুবই কম। যা আছে তাতেও সব বছর ভাল ফলও হয় না। সরকার থেকে যদিও চেষ্টা চলেছে যথাসাধ্য। শুধু কৃষি নয়, এখানকার দরিদ্র নিরক্ষর অধিবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ডাক ও তারঘর হাসপাতাল থানা এমন কি টেলিফোন পর্যন্ত চালু হয়েছে এখানে। সারা বছর বাস আসে শ্রীনগর থেকে। এখানে আসার দুটি পথ। একটি নাজিবাবাদ নেমে ছোট রেলে কোটদ্বার—সেখানে থেকে বাসে শ্রীনগর। আরেকটি ঋষিকেশ থেকে: প্রথমটিতে সময় ও অর্থের সাশ্রয়। দ্বিতীয়টিতে পুণ্যলাভ। হরিদ্বার, ঋষিকেশ ও দেবভূমি দেবপ্রয়াগ দর্শন করে

আসতে হয় এখানে।

বাস-পথে দেবপ্রয়াগ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ ৪৬ মাইল—ঘণ্টা চারেক সময় লাগে। ঋষিকেশ থেকে ৮৮ মাইল। পথে পড়ে শ্রীনগর—গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী। টুরিস্ট অফিস ও রেস্ট হাউস আছে।

বাস চালু হবার আগে দেবপ্রয়াগ থেকে এখানে আসতেই চারদিন হাঁটতে হত। কাজেই যাত্রীরা অন্ততঃ একটা দিন বিশ্রাম করতেন এখানে। দুটি ঘর ও বারান্দা নিয়ে ছোট একটি সরকারী ধর্মশালাই ছিল তাঁদের একমাত্র আশ্রয়। সকালে ধর্মশালার সামনে গুটিকয়েক গ্রামবাসী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে বসতেন। তারই নাম ছিল বাজার। রায়বাহাদুর জলধর সেন ১৮৯০ সাল যখন এখানে এসেছিলেন, তখন এখানে মাত্র তিন-চার ঘর গৃহস্থ বাস করতেন। অনেক চেষ্টা করেও তিনি একটু চিনি যোগাড় করতে পারেন নি।

আর আজ! আজ রুদ্রপ্রয়াগ নগরে পরিণত। কত দোকান-পাট, হাট-বাজার হোটেল রেস্ট হাউস হাইডেল পাওয়ার স্টেসন। চারিদিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে আলো দান করছে রুদ্রপ্রয়াগ।

শিক্ষার দিক থেকেও পিছিয়ে নেই রুদ্রপ্রয়াগ। স্বামী সচ্চিদানন্দ স্থাপিত সংস্কৃত টোল, কন্যা পাঠশালা ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল রুদ্রপ্রয়াগের নিরক্ষরতা দূর করতে সাহায্য করছে।

পঞ্চাশ বছর আগে স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে একজন অন্ধ সন্ন্যাসী এলেন এখানে। রুদ্রনাথ যাঁকে পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত করেছেন, তিনি রুদ্রপ্রয়াগের আঁধার ঘোচাবার তপস্যায় রত হলেন। নিঃস্ব সন্ন্যাসী লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রুদ্রনাথের মন্দির ও সঙ্গম ঘাটের আমূল সংস্কার সাধন করালেন। তৈরি করালেন হাসপাতাল, আয়ুর্বেদিক ঔষধালয় ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ।

সচ্চিদানন্দের সাধনা সার্থক হয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহ এখন সরকারী পরিচালনায় রুদ্রপ্রয়াগের উন্নতির উৎস হয়ে উঠেছে।

সচ্চিদানন্দ আজ নেই, আছে রুদ্রপ্রয়াগ। যতদিন রুদ্রপ্রয়াগ থাকবে ততদিন আমরা এই কর্মযোগী অন্ধ সন্ন্যাসীর স্মৃতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করব।

দরিদ্র এখানকার জনসাধারণ। দেবী অন্নপূর্ণার কৃপা-বঞ্চিত তারা। আজকাল বেশ কিছু দোকান-পাট হয়েছে। কিন্তু কেনাকাটা শুধু এই যাত্রার কয়েক মাস। যাত্রীরাই রুদ্রপ্রয়াগের অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের সামনেই রয়েছে দুটি মূর্তি—গোপালেশ্বর ও সোমেশ্বর। রাস্তা থেকে আর এক সারি সিঁড়ি নেমে গেছে মন্দাকিনীর তটে। অনেকে খানিকটা জলে নেমে স্নান করেন ওখানে। একে তো স্রোত কম, তার ওপরে স্থানটির মাহাত্ম্যও মন্দ নয়। ওখানে বসেই শিবের তপস্যা করেছিলেন শৈবাদিক নাগ। তাই চারিদিকের পাহাড়ের নাম নাগ টিব্বা। সে যাকগে। তপস্যা-তুষ্ট শিব তপস্যাচারী শৈবাদিক নাগকে তাঁর মাথার মণি করে রেখেছেন সেই থেকে।

যাঁরা ওখানের স্থান মাহাত্ম্যে তেমন বিশ্বাসী নন, তাঁরা দেবী অন্নপূর্ণার মন্দিরকে পেছনে রেখে এগিয়ে যান কালিকমলীর ধর্ম-শালার দিকে। খানিকটা জিরিয়ে, খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে, জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিয়ে পাড়ি জমান টানেলের পথে। নাগ পর্বত কেটে কেদারনাথের পথ তৈরি করা হয়েছে। এখন গুপ্তকাশী পর্যন্ত বাস যায়। বছর দশেক আগেও কেদারনাথের যাত্রীদের এখান থেকেই হাঁটা শুরু করতে হত। গুপ্তকাশী পর্যন্ত বাস গিয়ে সাতাশ মাইল হাঁটা পথ কমে গেছে। কমছে প্রতি বছরই। পাহাড় কেটে বাস পথ প্রসারিত করা হচ্ছে। অলকানন্দার পুলের ওপরে আর একটি পুল তৈরি করা হয়েছে। এখন কেদার যাত্রীদের আর নামতেই হয় না রুদ্র প্রয়াগে। ঋষিকেশ থেকে তাঁরা একই বাসে চলে যান গুপ্তকাশী।

বদ্রীনাথ যাত্রীদেরও রুদ্রপ্রয়াগে না নামলে চলে। আমরা যে

বাসে শ্রীনগর থেকে এখানে এসেছি, সে বাসই চলে যায় জোশীমঠ। কেদারনাথের যাত্রীদের কয়েক বছর আগেও এখানে নেমে পুল পেরিয়ে ওপার থেকে গুপ্তকাশীর বাসে উঠতে হত। এখন নতুন পুলের ওপর দিয়ে বাস যাতায়াত করছে।

চৌকিদার খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে—পুরী তরকারি ও দুধ। আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। নিঃসঙ্গ অবসরে চিন্তাই তো পরম সখা। নিজের মনের মুকুরে নিজেকে দেখা। কর্মব্যস্ত নাগরিক-জীবনে এ দেখার অবসর মেলে না। সিংজী বিদায় নেবার পরে রুদ্রপ্রয়াগের ডাকবাংলোর এই ঘরে আমি একা। একা বসে ভাবছিলাম কেদার-নাথের কথা, বদ্রীনাথের কথা, রুদ্রপ্রয়াগের কথা। চৌকিদারের আগমনে ভাবনার অবসান ঘটে। হাতের খাবার টেবিলের ওপর রাখল চৌকিদার। এখন এখানে রান্নার কোন প্রয়োজন হয় না। অনেক খাবারের দোকান হয়েছে। শুধু খাবার নয়, যাত্রাপথের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবই পাওয়া যায়—লাঠি জুতো, কম্বল ক্যানভাস, চাল ডাল, তেল নুন, আটা আলু, কুলি ঘোড়া, ডাণ্ডি-কাণ্ডি। এখানেও কুলি এজেন্সীর অফিস আছে।

ভাবলে অবাক হতে হয়—আগে মানুষ এখানে দিনের বেলায়ও একা চলতে ভয় পেতো। ভয়ের কারণ ছিল বই কি। পথ ছিল দুর্গম, আর ছিল নরখাদক বাঘ। ছিল না এই ডাকবাংলো, ঐ বাজার আর বাস স্ট্যাণ্ড; নিরাপদ পুল আর এত লোকজন। তা হলেও যাত্রীর অভাব হয় নি কোনকালে। পথ ভয়ঙ্কর হলেও দলে দলে পথিক এসেছেন রুদ্রপ্রয়াগে। বাঘের সঙ্গে আর অনাহারের সঙ্গে লড়াই করে তাঁরা গেছেন কেদার-বদ্রী দর্শনে। দুঃখ-কষ্টের ঊর্ধ্বে উঠেই তাঁরা তখন আসতেন এ পথে। আর আজ?···

আজ যাঁরা আসেন তাঁরাও তো সুখের প্রত্যাশী নন। দুঃখ-কষ্ট কমে গেছে সন্দেহ নেই। তবু যতটুকু আছে তাও আজ অনেকে সইতে চান না। যাঁরা চান, তাঁরা পুণ্যাত্মা কিনা জানি না, তবে তাঁরা

নিঃসন্দেহে দুঃখ-কষ্ট ও ভয়কে জয় করেছেন।

যাত্রীদের কথা নয়, আমি ভাবছি রুদ্রপ্রয়াগের কথা। পাহাড়ী জনপদ রুদ্রপ্রয়াগ— কালো কঠিন পাহাড়ে ঘেরা। পাহাড় শান্ত ও সুন্দর, নিশ্চল ও নিথর কিন্তু নীরব নয়। পাহাড় কথা কয় অমৃত-লোকের কানে কানে। সে কথায় ছন্দ আছে, সুর আছে, তাল আছে, লয় আছে। রুদ্রপ্রয়াগ যে রাগ-ভূমি—রাগ-রাগিণীর জন্মভূমি! তখন এখানে নরখাদক ছিল না, নর ছিল না। ছিল শুধু সীমাহীন পাহাড় আর শাশ্বত সঙ্গীত। সেদিনের সে সুর আজও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রতিক্ষণে।

সুরের সাধনায় নারদ এলেন এখানে। তিনি সুরস্রষ্টা শিবের তপস্যা শুরু করলেন। এক পায়ে দাঁড়িয়ে এক শতাব্দী ধরে তপস্যা করলেন। মুগ্ধ হলেন শিব। শিবানীকে নিয়ে নন্দীর পিঠে চড়ে তিনি এখানে এলেন। নারদকে বললেন, 'সার্থক তোমার তপস্যা। তুমি বর প্রার্থনা কর।

'আমাকে সঙ্গীত বিশারদ করুন, হে ভৈরব!'

'সঙ্গীতে তোমার কি প্রয়োজন, নারদ?'

'দেবলোকের দুঃখ দূর করব।'

'দেবলোকে তো কোন দুঃখ নেই দেবর্ষি। সে যে চির আনন্দের জগৎ। যেখানে রোগ নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, শোক নেই—সেখানে দুঃখ কিসের?'

'স্থায়ী আনন্দই সেখানে দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছে। আনন্দের একঘেয়েমি থেকে মুক্ত হতে চাইছেন দেবলোকবাসী।'

প্রসন্ন শিব তখন রুদ্রবেশে নাদচর্চা করলেন। ছয় রাগ প্রত্যেকেই তার ছয় স্ত্রী ও আট পুত্র নিয়ে এখানে উপস্থিত হলেন। রাগ-রাগিণীর মহাধ্বনিতে রুদ্রপ্রয়াগের আকাশ-বাতাস ব্যাপ্ত হল।

মন্দাকিনী অলকানন্দা আকুল হল।

ব্যাকুল হল অসীম পাহাড়।

নাদশাস্ত্রে পারদর্শী হলেন নারদ। নিজের বীণা তাঁকে দান করলেন শিব। বললেন, 'আজ হতে ত্রিভুবনে সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে আমার পরেই তোমার স্থান।'

রুদ্রনাথকে প্রণাম করে রুদ্রপ্রয়াগ ত্যাগ করলেন নারদ। বিশ্ব-নাথের বীণা হাতে তিনি পরমানন্দে পা বাড়ালেন দেবলোকের পথে।

# করুণাময় কেদারনাথ

বরফ! হ্যাঁ, সামনেই বরফ পড়ে রয়েছে। কালো পাথুরে পথ সাদা হয়ে গিয়েছে। আমরা রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বাস ধরে গুপ্তকাশী এসেছি। দর্শন করেছি। তুষারাবৃত হিমালয়। প্রথম দেখতে পেয়ে উদাস অলস মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলাম সেদিকে। তারপরে পাহাড়ের চুড়োয় বরফের সমারোহ দেখছি তিনদিন ধরে। একই দৃশ্য শেষে ক্লান্তি এনে দিয়েছিল। যে স্নো-রেঞ্জ দেখতে সবাই শত শত মাইল ছুটে আসে, সেই স্নো-রেঞ্জ আমার কাছে একঘেয়ে লাগছিল। সত্যই কি একঘেয়ে? সকালে যে ওখানে সোনার ছড়াছড়ি, দুপুরে রুপোর, বিকেলে রামধনু রংয়ের বন্যা। বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। তা হলে? বিরহ-যন্ত্রণায় ধুক্‌ছিলাম। সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে যে দূর থেকে হাতছানি দিচ্ছিল—তাকে কাছে পাবার অব্যক্ত আকুলতায় অধীর হয়ে উঠেছিলাম। এতক্ষণে তাকে কাছে পেয়েছি!

এই প্রথম পথে বরফ পেলাম। এতদিন ধরে যে ছবি এঁকেছি মনে, আজ এসে দাঁড়িয়েছি তার সামনে। ছবি প্রাণ পেয়েছে, স্বপ্ন সত্য হয়েছে। না—বাস্তব কল্পনার চেয়েও সুন্দর। অপরূপ। খুব ভাল লাগছে! আরও ভাল লাগবে ঐ কোমল অমল ধবল তুষারের ওপর দিয়ে পথ চলতে।

বালকের মত ছুটোছুটি করছি বরফের ওপর। হঠাৎ খেয়াল হল এভাবে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। সময় কম, পথ বেশি। আজ দুপুরে গৌরীকুণ্ড থেকে রওনা হয়ে আমরা মাইল তিনেক হেঁটেছি। রামওয়ারা চটি এখনও এক মাইল। সেখানে চা খেয়ে একটু জিরিয়ে

নিতে হবে। কেদারনাথ তার পরেও সোয়া তিন মাইল। খুবই চড়াই —প্রতি মাইলে প্রায় হাজার ফুট উঠতে হচ্ছে।

এই পথ পেরিয়ে কেদারনাথ পৌঁছতেই আজ আমাদের এত কষ্ট হচ্ছে। অথচ সেকালের পথ অনেক বেশি কষ্টকর ছিল। তবু দলে দলে পুণ্যার্থী রওনা হতেন কেদারনাথের পথে। সে পথ ছিল প্রকৃতই মহাপ্রস্থানের পথ। মহাভারতের যুগের কথা ভেবে লাভ নেই। লাভ নেই তার পরবর্তী কালের কথা ভেবে। কারণ সে-কথা তো ইতিহাস নয়, কাহিনী। আমি ভাবছি ইতিহাসের কথা—মাত্র গত শতাব্দীর ইতিহাস।

সবে বৃটিশ শাসন কায়েম হয়েছে গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে। মিস্টার জি. ডাবল্যু ট্রেল দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনার হয়ে এলেন। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি হিন্দু মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন। তাই এলেন কেদারনাথ দর্শনে। তিনি ছিলেন সুদক্ষ পর্বতারোহী। তাঁর পক্ষে দুর্গম পথ অতিক্রম করা সম্ভব হল। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের পথকষ্ট দেখে বিচলিত হলেন বৃটিশ শাসক। এই প্রসঙ্গে নৈনিতালের আবিষ্কর্তা পি. ব্যারন তাঁর 'Pilgrims Wanderings in the Himala ( ১৮৪৪ খৃঃ ) বইতে লিখেছেন—'Mr. Traill, being in the estimation of the Hill People second only to Vishnoo himself, had not much difficulty in prevailing on the priesthood to apply all their available funds to the construction of a road ; and accordingly from Sreenuggar to Kedarnath a splendid one was made ( 1827 A. D. ), with substantial bridges, over every river both large and small. It was also continued on to Badrinath.'

কেদারনাথের উচ্চতা ১১৭৫০ ফুট। চার ধামের মধ্যে উচ্চতম কেদারনাথ। সন্ধ্যের আগেই পৌঁছতে হবে। তিনটে বেজে গেছে।

পথে বরফের অভাব হবে না। কিন্তু দেরি করলে আলোর অভাব হবে। সে অভাবের পরিণাম ভয়ঙ্কর। অচেনা দুর্গম পথে কোথায় যেতে কোথায় যাব। জাহান্নামে যাওয়াও বিচিত্র নয় কিছু। কাজেই পা চালিয়ে চলি। কুলিরা বরফ দেখে উল্লসিত হয় নি। তারা পথের ইতিহাস স্মরণ করে নি। তারা এগিয়ে গেছে।

আমরা পাঁচজন—পূর্ণদা গদাদা রঞ্জন আমি ও সমীর। পূর্ণদা পঞ্চাশ পেরিয়েছেন, সমীর কুড়ির গণ্ডি অতিক্রম করে নি, আমরা তিনজন ওদের দুজনের মাঝে। ওদের বয়সের পার্থক্য যাই হক এক জায়গায় কিন্তু অদ্ভুত মিল। দুজনেই দাড়ি কামায় না। পূর্ণদা আচার্যদের মত দাড়ি রেখেছেন আর সমীরের থুতনির কাছে কয়েক গাছি কেশ। কিন্তু এই মিলটুকুর জন্যই সহস্রগুণ অমিল। খিটিমিটি লেগেই আছে।

গৌরীকুণ্ড থেকে আসা আমাদের এই সংকীর্ণ পাহাড়ী পথটি অকস্মাৎ এক খণ্ড প্রায় সমতল প্রশস্ত ভূখণ্ডে পরিণত—রামওয়ারা চটি। সারি সারি কুঁড়ে—চায়ের দোকান ও গোটাদশেক চটি। তাছাড়া রয়েছে কালিকমলীর ধর্মশালা। স্থানাভাব বিশেষ একটা হয় না। আসবাবপত্র না থাকলেও রাত্রিবাস করা যায়—লেপ কম্বল এমন কি কার্পেট পর্যন্ত ভাড়া পাওয়া যায়। রান্নার দরকার নেই - গমভাজা তেলেভাজা ঝুড়িভাজা পকৌড়ি বেসমের লাড্ডু এলাচদানা জিলিপি পেড়া পুরী ও মহিষের দুধ পাওয়া যায়। সাধু হলে তো কথাই নেই—সদাব্রত রয়েছে, সিধা পাওয়া যায়। শীতকে যাঁরা ভয় করেন, কেদারের পথে রামওয়ারাই তাঁদের বেসক্যাম্প। তাঁরা ভোরে রওনা হয়ে যান কেদারনাথ, পুজো দিয়ে সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসেন এখানে। এখানে শীত কম। জলের অভাব নেই। নিচে বয়ে যাচ্ছে মন্দাকিনী। একটা ঝরণাও আছে।

আমরা কিন্তু এখানে থামব না। এত কাছে এসেও কেদারনাথ দর্শন না করে সারারাত অপেক্ষা করার মত ধৈর্য আমাদের নেই।

"চল—ঐ দোকানেই যাওয়া যাক্।" একটু দূরের একটা চায়ের দোকান দেখিয়ে পূর্ণদা বলেন। সবাই এগিয়ে চলি সেদিকে—চা খেয়ে একটু জিরিয়ে নিতে হবে।

চায়ের পাট চুকেছে। রামওয়ারা ছেড়ে কেদারের পথে এগিয়ে চলেছি। চড়াই পথ। আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ পথ। পাশাপাশি দুজনে হাঁটা যায় না সব জায়গায়। বাঁয়ে খাদ ডাইনে পাহাড়। খাদের শেষেও পাহাড়ে পাইনবনের সমারোহ। অবশ্য জানি বলেই ওকে পাইনবন বলে বুঝতে পারছি। নইলে এখান থেকে শুধু একটা সবুজ প্রলেপের মত মনে হচ্ছে। ডাননিকে পাহাড়ের গায়েও সবুজের ছড়াছড়ি—শ্যাওলা আর কাঁটাগাছ। মাঝে মাঝে বরফ। মনে হচ্ছে সবুজ কমেছে সাদা বাড়ছে। বরফ ক্রমে শ্যাওলার জায়গা দখল করছে। দেখছি আর চলছি। দাঁড়াবার সময় যে নেই।

চারটে বেজে গেছে। শীত বাড়ছে। তবে খুব অসুবিধে হচ্ছে না। বেশ জোরেই হাঁটছি। হয়তো কেদারনাথ আমাদের পা দুটিকে সবল আর রক্তকে গরম করে তুলছেন। ভালই লাগছে। আমার একার নয়—সবারই। সমীর গুন্‌গুন্ করে গান গাইছে। আমরা চারিদিকে চেয়ে ভাল করে দেখে নিচ্ছি সব। পূর্ণদা তো আনন্দে আবৃত্তি করছেন তারস্বরে—"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মত নাচে রে·········।"

আমাদের হৃদয়ও নাচছে। কবি বোধ হয় এমনি কোন আনন্দঘন মুহূর্তেই রচনা করেছিলেন এই অপূর্ব কবিতা। ধন্য তুমি হে কবি। এই পথশ্রম, অনাহার ও অনিদ্রার মধ্যেও তোমারই ভাষা আমাদের মনকে সতেজ করে পথ চলার প্রেরণা যোগাচ্ছে। কবীশদলে মহাপুণ্যবান তুমি। পুণ্যবান আমরা—তোমার দেশ আমাদের দেশ, তোমার ভাষা আমাদের ভাষা।

"ফিরতে হবে।" ছন্দপতন হয় রঞ্জনের বেসুরো কথায়।

"কেন ?"

"বাইনোকুলার ফেলে এসেছি।"

ওদের এগোতে বলে আমি ও রঞ্জন ফিরে চলেছি রামওয়ারা চটিতে—চায়ের দোকানে। চা খাবার সময় ভারী বাইনোকুলারটা কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে রেখেছিল রঞ্জন। তুলে আনতে ভুলে গেছে। এখনও গিয়ে খোঁজ করলে হয়তো পাওয়া যাবে। হয়তো কেন—দোকানদার বা কোন স্থানীয় লোকের চোখে পড়লে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। যাত্রীদের নজরে পড়লে অবিশ্যি…না, তাই বা বলি কেমন করে? যাত্রীদের সবাই সৎ নয় সত্যি, তবে সবাই যে অসৎ নয়, সে কথাও মিথ্যে নয়।

দূর থেকে দেখেই দোকানদার আমাদের ইশারা করে। কাছে আসতেই বলে, "আমার গলতির জন্যই আপনাদের এই তক্‌লিফ।" আমাদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করে বলে চলে, "আমারই লক্ষ্য করা উচিত ছিল। আপনারা পথকষ্টে কাতর, আপনাদের ভুল হতেই পারে।"

দোকানীকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানিয়ে আবার উঠে এলাম রাস্তায়। দোকানী দাঁড়িয়ে রইল চটির বাইরে। তাকিয়ে রইল একান্ত আপন-জনের মত। শুধু সেই নয়, উপস্থিত খদ্দেররা পর্যন্ত অনুরোধ করে-ছিলেন আজকের রাতটা রামওয়ারায় কাটাতে। পথে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। রাত কালো আঁধারের ঘোমটা টেনে দেবে দেবভূমির মুখে। ঘরছাড়া দামাল ছেলেদের সে স্নিগ্ধ হেসে কাছে ডাকবে না। ধেৎ, তাও হয় নাকি? সন্তানকে কেউ দূরে সরিয়ে দিতে পারে? তাঁর আবরণ যাবে সরে। পরম স্নেহ দু-বাহু বাড়িয়ে তিনি সযতনে আমদের টেনে নেবেন কাছে।

তা হলেও আর দেরি নয়। দোকানী হয়তো আমাদের গোঁয়ার ভাবল। অন্যান্য যাত্রীরাও ভাবলেন বেপরোয়া। ভাবুন গে। তবু আমরা যাব। আজই যাব। আঁধারেও দুর্বার বেগে পথ চলব—চল, জল্‌দি চল।

পা-কে সজোরে চালাতে চাইলেও সব সময় জোরে পথ চলা যায় না। পা-কে চালায় যে মন, সেই মন হয়েছে বিকল। ক্রমাগতই থমকে দাঁড়াচ্ছি, ভুলে যাচ্ছি চলার কথা। প্রতি মুহূর্তে নতুন দৃশ্যের সম্মুখীন হচ্ছি। পাহাড়ের ঘন কালো ছায়া নিচের আলোময় উপত্যকাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে। সেই অতি পরিচিত পাইনবনের সারি আর ঝোপঝাড়ে ভরা সরু উপত্যকাটি ক্রমে ক্রমে কেমন যেন রহস্যময় প্রেতপুরীতে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের এখানে এখনও কিন্তু বেশ আলো রয়েছে। মাঝে মাঝেই নরম বরফ। শাণিত ইস্পাতের মত ঝক্‌ঝকে, চক্‌চকে। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে পাথরের ওপর কঠিন কালচে বরফ। বরফ পড়ছে কাঁটা গাছের ওপর—যেন স্বচ্ছ শুভ্র মসৃণ ওড়না দিয়ে কেউ ওদের মুখখানি দিয়েছে ঢেকে। ওড়না আবরণ নয়, আভরণ। ওড়না অপ্রকাশকে প্রকাশ করে, অপরিণতকে পরিণত করে, অসুন্দরকে সুন্দর করে।

ছবি তুলছি। কেবলই শাটার টিপছি। যা দেখছি তা-ই অপূর্ব। ইচ্ছে হচ্ছে—এই পথ, এই পাহাড়, ঝরণা আর আকাশ, সব কিছু মুঠো ভরে নিয়ে মনের মণিকোঠায়, মজুত করে রাখি। প্রকৃতি তুমি ধন্য, হিমালয় তুমি ধন্য, পথিক তুমি ধন্য—এই অনন্য সৌন্দর্য তুমি অনন্ত কাল ধরে উপভোগ করছ।

"দেখ দেখ কি সুন্দর!" আনন্দে চিৎকার করে ওঠে রঞ্জন।

ওকি এ যে মাটির বুকে 'ছায়াপথ' নেমে এসেছে। বরফের পুলের মত অর্ধবৃত্তাকার একটি বলয়। রাস্তা থেকে ওপরে উঠে খানিকটা শূন্যের ওপর দিয়ে গিয়ে আবার পথে নেমেছে। নিচে যখন জল নেই, পুল না বলে তোরণ বলাই ভাল। প্রকৃতির তৈরি তোরণ। কিন্তু কার জন্য তৈরি হল? মন নেচে উঠল—নিশ্চয় আমাদের জন্য। দেবভূমি আহ্বান করছে আমাদের। বলছে—'সুস্বাগতম্'।

রঞ্জন গিয়ে ঠিক তোরণের মাঝখানে দাঁড়াল। বলল, "ছবি নাও।"

"বা রে! একযাত্রায় পৃথক ফল? স্বর্গদ্বারে তুমি একা?"

"বেশ সেল্‌ফ-টাইমার লাগাও।"

সেল্‌ফ টাইমার লাগানো গেল। কিন্তু ক্যামেরা বসাই কোথায়? সর্বত্রই পিচ্ছিল বরফ। রঞ্জন বুদ্ধি যোগায়, "লাঠির স্পাইক দিয়ে গর্ত করে নাও।"

তাতেও সুবিধা হচ্ছে না। হঠাৎ·· হ্যাঁ, একেবারে হঠাৎ, বুদ্ধি খুলে গেল। গামছাখানা মাথা থেকে খুলে নিলাম। ভাঁজ করে বিছিয়ে দিলাম গর্তের ওপর। তার ওপরে রাখলাম ক্যামেরা; ছবি নেয়া হল।

ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে চলেছি এগিয়ে। কেদারনাথ আর কতদূর? বোধ হয় বেশী নয়। মনে হচ্ছে এসে গেছি। বই পড়ে, ছবি দেখে আর গল্প শুনে, মনের গহনে যে ছবি আঁকা হয়ে গেছে, তার সঙ্গে কেমন আশ্চর্য ভাবে এখানকার সব কিছু যাচ্ছে মিলে।

কিন্তু আমি তো শুধু প্রকৃতির সম্পদ আহরণ করতে আসি নি। কোথায় সেই গগনবিদারী মন্দিরশীর্ষ—যে মেঘের ওপরে মাথা তুলে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে আপন মহিমায়। ঘোষণা করছে—বাবা কেদারনাথের অতুল ঐশ্বর্য, বিপুল পরাক্রম, আর অসীম ক্ষমার কথা। কোথায় সেই মন্দাকিনীর মন্দাক্রান্তা-পদসঞ্চার?

মন্দাকিনী একটু আগেও ছিল আমাদের সঙ্গে। রাস্তার অনেক নিচে। বলছিল—তোমরা যেখানে যাচ্ছ, আমি সেখান থেকেই আসছি। তোমরা যেখান থেকে আসছ, আমি সেখানেই যাচ্ছি। ভয় পেও না, ক্লান্ত হয়ো না, এগিয়ে চল, আমি যেমন তীরবেগে চলেছি আপন পথে—তাঁর চরণামৃত নিয়ে, তোমাদের মর্তলোকের তাপ ও পাপ হরণ করতে।

সেই মন্দাকিনী অদৃশ্য হয়েছে একটু আগে। বিচলিত হই নি। শুনেছি সে এমনি করেই যাত্রীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। তবে যেখানেই যাক্, সে আবার মিলিত হবে আমাদের সঙ্গে। কেদারনাথের

চরণতলে সে আমাদেরই মত প্রণতি জানাবে। তাহলে এই কি তার শেষ লুকোচুরি খেলা? কেদার কি এসে গেছে?

অনেকটা এগিয়েছি। সূর্য চলে গেছে সামনের পাহাড়ের আড়ালে। ঐ পাহাড়ের পরপারে যাওয়া যায় কিনা জানি না। গেলেও কি আর সূর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে? না, সে ততক্ষণে চলে যাবে পৃথিবীর পরপারে।

কিন্তু এই তো 'মহাপ্রস্থানের পথ।' এ পথের প্রান্তেই তো পৃথিবীর সীমান্ত। তার পরে অসীমের রাজ্য। সীমা ও অসীমের মাঝে কেদারনাথ—দু-রাজ্যের দিকেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখছেন। কেউ যাতে ছাড়পত্র ছাড়া সীমানা লঙ্ঘন করতে না পারেন। কেদার থেকে ফিরে গিয়ে কেউ অধিকতর সংসারী হন। কেউ অসীমের অন্বেষণে বাকী জীবনটা বিলিয়ে দেন।

আমি কি করব? জানি না। কেউ আগের থেকে জানতে পারে না। পারবে কেমন করে? পার্থিব ও অপার্থিব আকর্ষণ-বিকর্ষণ ওজন করে তার পর কেদারনাথ নির্দেশ দেবেন, ছাড়পত্র দেবেন।

পাহাড়ের কালো ছায়াটা পথের ওপর আছড়ে পড়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। এবারে সে ছায়া ঘন হচ্ছে—কালো থেকে কৃষ্ণকালো। দিন ফুরাল, সন্ধ্যে হল, পার কর আমাদের। কিন্তু কাণ্ডারী কোথায়?

নির্জন অচেনা পথ। সঙ্গে আলো নেই। টর্চ কুলিদের কাছে। ওরা সবাই বোধ করি এতক্ষণে কেদারনাথ পৌঁছে গেছে। ঘর পেয়েছে, আলো জ্বালিয়েছে, খুব সম্ভব চা-ও খাচ্ছে। ভাবতেও ভাল লাগছে—না, না, খারাপ লাগছে, খুব খারাপ। ওরা স্বর্গে বসে স্বর্গসুখ উপভোগ করছে, আর আমরা স্বর্গ-নরকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করছি।

ছায়া ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। পথ ক্রমেই দুর্গম হচ্ছে। উর্ধ্বমুখীপথ, বাঁকের পর বাঁক। শীত বাড়ছে, বাতাস বাড়ছে। দমকা হাওয়ায় শিউরে উঠছি আর থর থর করে কাঁপছি। মনে হচ্ছে হাড় সুদ্ধ নড়ছে।

এখনও পাহাড়ী পথ শেষ হয় নি। এর পরে পেরোতে হবে একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর—তার পরে মন্দাকিনী ডিঙিয়ে কেদারনাথ।

বরফ উড়ছে, কাঁটাবন তুলছে, নানা রকমের শব্দ হচ্ছে। দামাল বাতাস পাহাড়ের দ্বারে গিয়ে অনধিকার প্রবেশ করতে চাইছে। সশব্দে প্রতিবাদ জানাচ্ছে পাহাড়। গুম্ গুম্ একটা ধ্বনি উঠছে।

শব্দটা যেন বাড়ছে। কিন্তু কোথা থেকে শব্দটা আসছে? এখানে নয় তো? তবে কি অন্য কোথাও? হতে পারে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে শব্দ বাড়ে, ভেসে যায় বহুদূরে। দূরের শব্দ ভেসে আসছে এখানে। শব্দ বাড়ছে।

রঞ্জন চলেছে আগে, আমি পেছনে। রঞ্জন গান গাইছে। কষে গীত গাইলে শীত কমে, ভয় কমে—পথ তাড়াতাড়ি ফুরোয়।

কড় কড় কড়াৎ। এ কি বিদ্যুৎ? না। তবে? আমার বাঁদিকের পাহাড়টা নড়ছে! ভেঙে পড়বে নাকি? তাই তো! পাহাড়টা ভেঙে পড়ছে···যেখানে যেমন ছিলাম স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলাম। পালাবার ফুরসত নেই। আর এক মুহূর্ত। তার পরেই আমরা এই ধ্বসের নিচে চাপা পড়ব। কাল সকালে যাত্রীরা আমাদের বিকৃত দেহ দেখে শিউরে উঠবেন। সমবেদনা জানাবেন। কেদারে যাওয়া আর হল না আমাদের। কেদার রইল দূরে। আমাদের পার্থিব পদক্ষেপের বাইরে।

কিন্তু এ আমি ভাবছি? মরণ যদি এসেই থাকে, তাকে বরণ করব অম্লান বদনে। তাই বলে কর্তব্য বিস্মৃত হব? ধ্বসের এই জীবন্ত ছবিটা ক্যামেরায় ধরে রাখব না? সে ছবি আমাদের দেখা হবে না। না হক! শুধু আমার মৃতদেহের সঙ্গে যাঁরা ক্যামেরাটা কুড়িয়ে পাবেন, তাঁরা জানবেন আমি মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কর্তব্য বিস্মৃত হই নি। প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্য দেখতে এসেছিলাম। সৌন্দর্যমদিরা পান করতে করতে প্রকৃতির প্রলয়-নাচনও উপভোগ করেছি—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

ক্যামেরা ঠিক করাই আছে। শাটার টিপলাম।

কতকগুলো বরফ ও পাথরের টুকরো এসে আমার মাথায় ঘাড়ে ও পিঠে পড়ল। দেবভূমি দুলছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। চেতনা অসাড় হয়ে এল। মরণ বুঝি বরণ করল আমাকে। আমি চোখ বুজলাম।

॥ দুই ॥

না, আমার শরীরে কোথাও তো কোন যন্ত্রণার অনুভূতি নেই। আমি চোখ মেলে তাকাই।

সামনের সমস্ত পথটা মুছে গেছে। পড়ে আছে বরফ আর পাথরের স্তূপ। রঞ্জন? রঞ্জন কোথায়? সে যে আমার সামনে ছিল — যেখান থেকে শুরু হয়েছে ঐ ধস্!

"রঞ্জন!" আকুলকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠি। আর্তনাদ আঘাত করে পাহাড়কে। প্রতিধ্বনিত হয় রঞ্জন···রঞ্জন···রঞ্জন। উত্তর মেলে না সে আহ্বানের।

না—মিলেছে। ঐ যে ভেসে আসছে, "মহারাজ!"

আছে, রঞ্জন আছে, "কোথায় তুমি?" আমি চিৎকার করে উঠি।

"এই যে এখানে।"

আওয়াজের নিশানা ধরে স্তূপের দিকে এগিয়ে যাই। আবছা আলোয় কোন হদিস পাই না। আরে! ঐ তো। পাথর আর বরফের স্তূপের মধ্যে কি যেন একটা নড়ছে। লাঠি। হ্যাঁ, রঞ্জনেরই লাঠি। লাঠি উচিয়ে বরফের তলা থেকে জানান দিচ্ছে রঞ্জন। আমিও লাঠি উঁচু করে ধরি। আশ্চর্য! রঞ্জন ঠিক ধসের ওপারে আর আমি এপারে। আমাদের দুজনের মাঝে নেমেছে এই ভয়াবহ ধস অথচ কাউকেই স্পর্শ করে নি। কেমন করে বেঁচে গেলাম আমরা? কে বাঁচালো আমাদের! কেদারনাথ—সেই পরমপুরুষ? না, প্রকৃতি?

প্রণতি জানাই দুয়ের উদ্দেশ্যে। এরা উভয়েই উভয়ের বিচিত্র প্রকাশ বই তো নয়!

পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম, এখানে ধস নেই। ধস এড়িয়ে পা টিপে টিপে নেমে এলাম নিচে, একেবারে রঞ্জনের কাছে। রঞ্জন আমাকে জড়িয়ে ধরল সবেগে! ব্যবধান ঘুচে গেছে। আমরা আবার মিলিত হয়েছি। যদিও মিলনের এ উচ্ছ্বাস এক বিয়োগান্ত নাটক রচনা করতে পারত—পা-টা একটু এদিক-ওদিক হলেই।

একটা বরফের নদী। দূরবীন দিয়েও ভাল দেখা যাচ্ছে না। তবু মনে হচ্ছে ওপারে পথের রেখা রয়েছে। তা হলে এ বরফাবৃত নদী পেরোতে হবে। দু-পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চঞ্চলা চপলা কিশোরীর মত উচ্ছল আবেগে প্রবাহিত হচ্ছিল যে স্রোতস্বিনী, সে কোন্ দুর্বাসার অভিশাপে হল জরাগ্রস্থ। তার গতি হল স্তব্ধ। জীবন হল স্পন্দনহীন। বিক্ষুব্ধ জলধারা পরিণত হল শান্ত সমাহিত হিমানীতে।

বরফের আকৃতি এখানে স্বতন্ত্র! নরম নয়, শক্ত বরফ—জমাট বাঁধা, শ্বেত-পাথরের প্রশস্ত অলিন্দের মত। ডুবে যাবার ভয় নেই। তবে মসৃণ ও পিচ্ছিল। আছাড় খেয়ে হাত-পা ভাঙা অস্বাভাবিক নয়। তা হলেও সাবধানী পদক্ষেপে একসময় নির্বিঘ্নে নদী পেরিয়ে এলাম।

পথের আলো ফুরিয়েছিল খানিক আগেই। তবু আকাশের আলোর রেশটুকু ছিল চারিদিকে। এবারে সে আলোটুকুও বিদায় নিল। মেঘের ফাঁকে আকাশ আর উঁকি দিতে দেখছি না। মেঘ আর আকাশ, পথ আর পাহাড়, সব একাকার হয়ে গেছে। বিলীন হয়েছে কালো আঁধারে। রাত নেমে এসেছে কর্মক্লান্ত ধরণীর বুকে। ক্লান্ত আমরাও তবু আমাদের অবসরের অবকাশ নেই। আমাদের চলতে হবে! সামনে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম পথ। অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে পথ চলছি।

জল। হ্যাঁ, জল পড়ল। মাথায় পড়ে গাল বেয়ে নামছে। তবে কি বৃষ্টি নামল? তাই তো—আমার মাথা খালি কেন? গামছা—আমার গামছা কোথায়? টুপিটা ঝড়ে উড়ে গেছে গতকাল বিকেলে। সেই থেকে গামছাই আমার মাঙ্কি ক্যাপের কাজ করছিল। গামছাটা গেল কোথায়?

মনে পড়েছে—সেই বরফের তোরণের ছবি নেওয়ার সময় শেষ দেখেছি। তারপরে—তারপরে আর গামছাখানি তুলে আনি নি। আনন্দে মত্ত হয়ে শুধু ক্যামেরা নিয়েই রওনা দিয়েছি। এখন মাথাটাকে নিয়ে কি করি? এখুনি যে ঝিম ঝিম করছে, এর পরে তো ঘিলু সুদ্ধ জমে যাবে। ঘোড়ার জন্য রাজ্য গিয়েছিল, আমার যে গামছার জন্য প্রাণ যায়।

বৃষ্টি কমে আসছে কি? না মাথার অনুভূতি অসাড় হয়ে গেছে? হাত দিয়ে পরখ করে বুঝলাম বৃষ্টি ধরেছে। আর জল পড়ছে না। যাক্ এযাত্রা বোধ হয় বেঁচে গেলাম।

কিন্তু এ কি? না, জল নয়। অন্য কিছু পড়ছে। মাথার ওপর—হাল্কা নরম, উঃ ভীষণ ঠাণ্ডা। তবে কি তুষারপাত শুরু হল? আকাশের জল স্থান-মাহাত্ম্যে মধ্যপথেই রূপান্তর লাভ করছে। তুষারকণা চোখেমুখে সজোরে ঝাপটা মারছে।

সহসা আঁধারের আবরণ ছিঁড়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। একবার দুবার—তিনবার। এর মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেলাম পাহাড়ের গা থেকে একখানি পাথর বেরিয়ে এসে পথের খানিকটা ঢেকে রেখেছে। যেন ঘরের আলসে—গাঁয়ের বাড়িতে যেমন খড়ের ছাউনি খানিকটা বেরিয়ে থাকে বেড়ার সীমানা ছাড়িয়ে। ওখানে দাঁড়ালেও গায়ে তুষারের ছাঁট লাগবে। তা লাগুক। গায়ে বর্ষাতি আছে। মাথাটাই সমস্যা। তুষারপাত বন্ধ হলে আবার চলা শুরু করব। দাঁড়ালাম এসে সেই পাথরের নিচে—প্রকৃতির দেয়া ছাতার তলায়। রুমাল দিয়ে মাথা মুছলাম। মাথা শুকলো না কিন্তু রুমাল ভিজে গেল। যাক্

গে নিজেই যখন ভিজেছি তখন রুমাল আর বাকি থাকে কেন ?

অবশেষে একসময় তুষারপাত বন্ধ হল। তবে হাওয়া বন্ধ হয় নি। বিপরীতমুখী হাওয়া কানের মধ্য দিয়ে একেবারে মরমে পশে মস্তিষ্ক জগতে বিপর্যয় শুরু করে দিয়েছে। ক্রমেই কেমন অসাড় ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি।

"এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। চলা বন্ধ করেই লোক শীতে মারা পড়ে।" কম্পিতকণ্ঠে রঞ্জন বলে ওঠে।

উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলি। খুবই সাবধানে। অসমতল সংকীর্ণ চড়াই। পাহাড় ধরে ধরে অন্ধের মত লাঠির ভর করে চলেছি এগিয়ে। পাথরে ঘষা খেয়ে হাত-পা সমানেই ছড়ছে। তবে ব্যথা লাগছে না—রক্ত ঝরছে না। বোধশক্তি বিলুপ্ত হয়েছে-- রক্ত জমে গেছে। এখন ধস্ নামলে ? মরতে হবে—কাপুরুষের মত। ঘন অন্ধকারে ছবি তোলাও সম্ভব হবে না।

জলের শব্দে চমকে উঠি। এখানে জল আসবে কেমন করে ? যা ঠাণ্ডা তাতে তো এখন এখানে জল, জল থাকতে পারে না। যেমন করেই থাকুক, শব্দটা জলের। তরল সচল জল। মনে হচ্ছে ঝির ঝির ধারায় বয়ে চলেছে। ইস্ জুতোটা ভিজে গেল একেবারে। জলের মধ্যে পা দিয়েছি। জলটা কি গরম নাকি ? হ্যাঁ বেশ আরাম লাগছে। তা হলেও পা তুলে আনি। জলের ধারে বসে পড়ি। হ্যাঁ যা ভেবেছিলাম—জল থেকে গন্ধকের গন্ধ আসছে। বসে থাকতে ভালই লাগছে। আগুন তো নেই, জলই পোয়ানো যাক্।

এভাবে কতক্ষণ বসে থাকব ? না থেকেই বা উপায় কি ? কিন্তু আমরা এখন কোথায় রয়েছি ? কেদারনাথ কত দূরে ? কোনদিকে ? পথের অনেক কথাই শুনেছি নানা মুখে, কিন্তু এই গন্ধকের ঝরণার কথা তো কেউ বলে নি। এ পথ কি তবে কেদারনাথের পথ নয় ? কে জানে ? অন্ধকারে অচেনা পথে কোথায় যেতে কোথায় এসেছি। তা হলে কি এখানেই বসে থাকব সারারাত ? কিন্তু জলের এটুকু

উত্তাপ কি আমাদের গরম রাখতে পারবে?

শীত বাড়ছে, কুয়াশা ঘন হচ্ছে। বাতাসের দাপট এখনও কমে যায় নি—যে কোন সময় আবার বাড়তে পারে। এখানে থাকলে মৃত্যু অবধারিত। এমনি করে মরণের কাছে হার মানব?

কিন্তু কেন? কেন আমাদের এই অপমৃত্যু? আমরা তো কারও প্রতি কোন অবিচার করি নি। অন্যায় করি নি। আমাদের অপরাধ? দুঃসাহস করেছি—আলো ছাড়া কেদারনাথের পথে পা বাড়িয়েছি। কিন্তু কেদানাথ যে শুনেছি দুঃসাহসীকেই প্রশ্রয় দেন, আশ্রয় দেন তাঁর পদতলে। কাপুরুষের জন্য কেদারের পথ নয়। তবে কেন এই দুর্ভোগ? কষ্ট না করলে তাঁর দর্শন মেলে না। দুঃখের পালা পূর্ণ হলে তবেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পালা। তা হলে কি এখনও দুঃখের কিছু বাকি?

'ঈ .....ঈ......'

মানুষ—হ্যাঁ মানুষের স্বর। কোথায়? সচকিত হয়ে উঠি। পেছন ফিরে তাকাই। না—কিছু নয়। কেউ নয়। ভুল শুনেছি—কিছুই শুনি নি। মনের ভুল! এখানে এখন মানুষ আসবে কেমন করে? কেনই বা আসবে?

গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে কম্পিত বক্ষে আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি। না দাঁড়িয়েই বা কি করব? হোঁচট্ খেয়ে, আছাড় খেয়ে, সর্বশরীর ব্যথায় জর্জরিত। আর অন্ধকারে পথ চলা সম্ভব নয়।

"শেঠজী......ঈ......" আবার ডাকছে।

ভুল নয়। কেউ কাউকে ডাকছে। কে ডাকছে? কাকে ডাকছে? আমাদের নয় তো? শুনেছি নিশীথেই নিশি ডাকে। নিশি? তবু সাড়া দেব। আমরা অপেক্ষা করব—আত্মসমর্পণ করব। কিন্তু গলা দিয়ে যে শব্দ বেরোচ্ছে না। রঞ্জন চেষ্টা করে। তার গলা দিয়ে শব্দ বেরোয়, কিন্তু সাড়া জাগায় না।

একটা আলোর বিন্দু—দুলছে, বাড়ছে—এগোচ্ছে। কেটে গেল আরও কিছুক্ষণ। এবারে দেখতে পেয়েছি। একটা লোক—হ্যাঁ একজন মানুষ আলো হাতে এদিকে আসছে। নিশি নয়—দেবদূত। আমাদের জীবনের আলো নিয়ে এসেছে। করুণাময় কেদারনাথ পাঠিয়েছেন।

ঐ এসেছে···মাথায় টুপি, গায়ে ওভারকোট, পায়ে জুতো, পিঠে বোঁচকা। হাতে সেফ্‌টিল্যাম্প আর লাঠি। লাঠির মাথায় ওটা কি? গামছা?

আলো ছিল না—আলো এল। পথ জানি না—প্রদর্শক এল। গামছা হারিয়েছিলাম—ফিরে পেলাম। জয় বাবা কেদারনাথের জয়।

কথার টানে বুঝলাম—লোকটি গাড়োয়ালী। মলিন পোশাক, মুখে কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের রং ফরসাই বলা যেতে পারে। বয়স? মুখ দেখে পাহাড়ীদের বয়স বোঝা ভার। তবু মনে বছর পঞ্চাশেক হবে। আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করল তার চোখ দুটি। অদ্ভুত উজ্জ্বল দুটি ছোট ছোট চোখ। চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। এমন ভাস্বর চোখ আমি কখনও দেখি নি।

সে চলছে আমাদের আগে আগে—আলো দেখিয়ে, পথ দেখিয়ে। বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ছে, বেশী উঁচু নিচু হলে আস্তে আস্তে হাঁটছে। বোধ হয় আমাদের জন্যই তার এ সাবধানতা। নাহলে ওর চলার গতি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ অব্যাহত।

দু-পক্ষই মোটামুটি নীরব। হয়তো আমরা আলাপে অনাসক্ত ভেবেই সে চুপ করে আছে। আমরা কিন্তু নিরুপায়। কণ্ঠনালী অসহযোগ ঘোষণা করেছে। গামছা দিয়ে আচ্ছা করে মাথা ও কান ঢেকে নিয়েছি। এখন শীত একটু কম লাগা উচিত। মনে করতে চাইছি কাল এসময় কোথায় ছিলাম। মনে পড়ছে না। পড়লে বুঝব স্বাভাবিক হয়েছি। এতক্ষণ যে, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে

ছিলাম তাতে স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে।

পড়েছে—মনে পড়েছে। গতকাল রাত কেটেছে গৌরীকুণ্ডে। পরশু ? পরশু রাতে আমরা ছিলাম গুপ্তকাশী। তার আগের রাত রুদ্রপ্রয়াগে।—রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ তেতাল্লিশ মাইল। ঋষিকেশ একশ উনত্রিশ……

রঞ্জন তিনবার গলা ঝেড়ে নিয়ে কোনমতে বলে, "গামছাটা পেলেন কোথায় ?"

"পথের ওপরে। বুঝলাম কোন যাত্রী অসময়ে গেছেন কেদারের দিকে। তাদের কাছে আলো নাও থাকতে পারে। তাই ডাকতে ডাকতে পথ চলছিলাম।"

অবাক হলাম। গামছাটা তো ঠিক পথের ওপরে ফেলে আসি নি। তবে কি ঝড়ো হাওয়ায় পথের ওপরে এসে পড়েছিল ?

"আপনি কোথায় যাবেন ?" আমি কোনমতে বলি।

"যাবার জায়গা এখানে একটাই—বাবা কেদারনাথের পদতলে।" তাঁর স্বরে ভাবের ব্যঞ্জনা।

বলি, "কোথায় গিয়েছিলেন ?"

"রামওয়ারা।"

"কেন ?"

পিঠের বোঁচকা দেখিয়ে বলেন, "এইটে আনতে।"

"ওতে কি আছে ?" জিজ্ঞেস করি।

"পুজোর উপকরণ। কাল সকালেই দরকার। তাই তো এই জলঝড়ের মধ্যে ফিরতে হচ্ছে।" ওর পোশাকের দিকে তাকাই। একেবারে শুকনো খট্‌খটে। সেফ্‌টিল্যাম্পটা নড়ে ওঠে। হাত ফস্‌কে পড়ে গিয়েছিল প্রায়। পড়লে আবার যে তিমিরে সে তিমিরেই। যাক্, কোন রকমে সামলে নিয়েছে। বলে, "একটা গুহায় ঢুকে পড়েছিলাম। চেনা পথ। তাছাড়া আলো রয়েছে সঙ্গে।"

তা রয়েছে। রয়েছে বলেই আমাদের প্রাণও রয়ে গেল। নইলে

—আর ভাবা যায় না।

নিঃশব্দে হেঁটে চলেছি। পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পথের বুকে—পাহাড়ের গায়ে। নির্জন পথ চমকে উঠছে। নিথর পাহাড় সচকিত হচ্ছে। চমকে উঠছি আমরাও। লোকটি না এলে আমাদের কি হত এতক্ষণে? আবার সেই কথা। অবাধ্য মন। কিছুই যে হয় নি, এইটেই আসল কথা। কি হত, তা ভেবে কি হবে?

আমাদের দু-দিকেই পাহাড়। আগের মতই বাঁদিকে পথের পাশে পাহাড় চলেছে, ডান দিকে খাদ। কিন্তু খাদের ওপারেই খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। তবে কি আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে? বরফাবৃত চুড়োয় চাঁদের আলো পড়েছে? আকাশ ও পাহাড়কে চাঁদ আপন আনন্দের ছন্দে আনন্দিত করে তুলেছে? কিন্তু কুয়াশা? সে গেল কোথায়?

জ্যোৎস্নার ছিটেফোঁটা এসে পড়েছে পথের ওপরে। আশ্চর্য প্রকৃতি। একটু আগের সেই ভয়ঙ্করী রূপের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই এখন। জগতে সব কিছুই পরিবর্তনশীল, কিন্তু প্রকৃতির মত এত অতর্কিতে বোধ করি কিছুরই পরিবর্তন হয় না। গ্রীষ্ম-বিদগ্ধ ধরিত্রীর বুকে নেমে আসে অতর্কিতে অতিবর্ষণের সমারোহ। বর্ষাক্লান্ত পৃথিবীর প্রাণে হঠাৎ লাগে শরতের সাড়া। শিশির-সিক্ত হেমন্তের কুঞ্জবনে অকস্মাৎ জাগে শীতের শিহরণ। পত্রহীন বৃক্ষের শাখায় শাখায় একদিন দেখা দেয় অঙ্কুর। আমের বনে মৌমাছিরা আনাগোনা করে শুরু, কোথা থেকে কোকিলের কুহুরব ভেসে আসে—আসে বসন্ত।

খানিকক্ষণ ধরেই শব্দটা শুনছিলাম। কত রকম শব্দই তো ভেসে বেড়ায় পাহাড়ে পাহাড়ে—জলের শব্দ, বাতাসের শব্দ, ধসের শব্দ। শব্দটা ক্রমেই বাড়ছে। মনে হচ্ছে নদী। আমরা কি মন্দাকিনীর মন্দিরা শুনতে পাচ্ছি?

ডানদিকের পাহাড়টা দূরে সরে যাচ্ছে। বাঁ দিকে এখনও পথ ঘেঁষে পাহাড়। না, সে-ও সরে যাচ্ছে দূরে। আমরা একটা বিস্তীর্ণ

উপত্যকায় উপনীত হয়েছি। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা সুরক্ষিত এই উপত্যকা। পাপের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন এই পুণ্যভূমি। নির্মল জ্যোৎস্নালোকে ঝলমল করছে 'দেও-দেখানি'—কেদারনাথধামের প্রবেশ পথ।

ভাগ্যিস কুয়াশা আর মেঘ নেই। থাকলে দেও-দেখানির এ রূপ আর দেখা হত না। এখানে শুনেছি দিনেও কুয়াশা থাকে। আর মেঘ? মেঘের ওপরে স্বর্গ সুবিধা পেলে মেঘ এসে স্বর্গ দখল করে নিতে কসুর করে না। স্বর্গরাজ্যকে অবরোধ করে রাখে। স্বর্গারোহণ কষ্টকর হয়।

উপত্যকার এক প্রান্তে দেও-দেখানি। অপর প্রান্তে সুমেরু পর্বতমালা। সুমেরুর মধ্যস্থলে মহাপন্থ ২ ১৪০ ফুট। মহাপন্থের পাদদেশে কেদারনাথের মন্দির।

'The first glimpse of the temple, and the mysterious and terrific-looking mountain overlooking it, made me pause and wonder whether it could be reality.' পি. ব্যারন ১৮৪২ সালে এসেছিলেন এখানে। সোয়া শ' বছর আগে সেই বিদেশী শিকারী এখানে দাঁড়িয়ে যে কথা ভেবেছিলেন, আমিও আজ সেই একই ভাবনায় স্তব্ধ হয়ে গেছি।

পাথরময় সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর। গাছপালা কিছু নেই—শুক্নো ঘাস আর কাঁটাঝোপ। প্রান্তরের বুক চিরে ক্ষিপ্ত উন্মত্তবেগে প্রচণ্ড গর্জনে প্রবাহিত হচ্ছে মন্দাকিনী। ওপারে লোকালয়, এপারে কোন জন-বসতি নেই। মন্দাকিনীর তীর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। মহাপ্রস্থানের পথ। পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে পথ। অসমতলকে সমতল করার চেষ্টা হয়েছে। পথটা বেশ প্রশস্ত—পাশাপাশি জনচারেক চলা যায়।

পথটা বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। নেমে গেছে নিচে—মন্দাকিনীর কাছে। এখান থেকে মন্দির প্রায় এক মাইল।

দেখতে পেয়েছি—এইবার স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। মন্দিরের চূড়া।

মহাপন্থের পায়ের কাছে বিরাজ করছে আপন মহিমায়। দুপাশে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে সুমেরুর পঞ্চপর্বত—রুদ্রহিমালয় বিষ্ণুপুরী ব্রহ্মপুরী উদ্গারী কণ্ঠ ও স্বর্গারোহিণী। স্বর্গারোহিণীতে আরোহণ করতে গিয়েই নাকি দেহরক্ষা করেন ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব। যুধিষ্ঠির শুধু ছিলেন বেঁচে। আমরাও আছি বেঁচে। মরণকে জয় করে এসেছি স্বর্গারোহিণীর পদপ্রান্তে।

খুব বেশী দিনের কথা নয়। একশ বছর আগেও বহু পুণ্যার্থী এখানে এসে মরণকে বরণ করে অমর হতে চাইতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, মাইল ছয়েক দূরে ওই মহাপন্থের শিখরে হিমলিঙ্গেশ্বর শিব আছেন। তাঁকে স্পর্শ করতে পারলে স্বশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়।

বিনা অনুমতিতে কেউ মহাপন্থায় যেতে পারতেন না। তাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও টিহ্‌রীরাজের এক যুক্ত বাহিনী এখানে মোতায়েন থাকত। ছত্রিশজন শক্তিশালী গাড়োয়ালী ছিল এই বাহিনীতে। একবার একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ নিজের সব জিনিসপত্র এমনকি পরনের জামাকাপড় পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়ে, কেবল একখানি কম্বল গায়ে মাইল খানেক চলে গিয়েছিলেন। রক্ষীরা টের পেয়ে, কয়েক ঘা লাগিয়ে তাঁকে বেঁধে নিয়ে আসে। ব্রাহ্মণ তখন উপায়ান্তর না দেখে অন্য একটা পাহাড়ের দিকে অগস্ত্য যাত্রা করেছিলেন।

যাঁরা মহাপন্থায় যেতে চাইতেন তাঁদের বারো বছর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করতে হত। তারপরে নিজের পায়ের ওপর হাঁড়ি বসিয়ে চরু রেঁধে ও খেয়ে, টিহ্‌রীরাজের কাছে মহাপন্থায় যাবার আবেদন করতে হত। রাজা তখন তাঁকে মহাসমাদরে প্রাসাদে রেখে চর্ব্য-চুষ্যলেহ্যপেয় খাইয়ে, রূপসী যুবতীদের তাঁর সেবায় নিযুক্ত করতেন। এই ভাবে দু তিন মাস বাস করার পরেও যদি তাঁর কোন বিকার না জন্মাত তবেই তিনি মহাপন্থায় যাবার অনুমতি পেতেন।

বাস্তবিক পক্ষে মহাপন্থা বা মহাপ্রস্থান আত্মহত্যা ছাড়া কিছুই

নয়। মন্দির থেকে মাইল চারেক দূরে, চোরাবারিতাল ছাড়িয়ে ভৈরোঁ ঝাঁপ বলে একটা জায়গা এখনও কেউ কেউ দর্শন করতে যান। ওখান থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করাকেই মহাপন্থা গমন বলা হত। পরবর্তীকালে, বৃটিশ আমলে, আইন করে এই প্রথা রহিত করা হয়েছে।

প্রাচীন কালে কিন্তু মহাপ্রস্থানের যাত্রীরা ভৈরোঁ ঝাঁপ থেকে ঝাঁপ দিতেন না। সেকালে সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। তাঁদের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের অধিকার ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁরা বানপ্রস্থ নিয়ে এখানে আসতেন। তারপর স্বর্গারোহিণী পেরিয়ে বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভের জন্য বৈকুণ্ঠ বা বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে চলতে থাকতেন। সেকালে ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ ছিলেন শৈব। তাঁরা ব্রহ্মপদ-লাভের জন্য বদ্রীনাথ থেকে একই পথে কেদারনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন। তাঁদের এই যাত্রাকে বলা হত ভৃগুপাত। ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে জরা ব্যাধি ও বার্ধক্যে ক্লিষ্ট না হয়ে সুস্থদেহে সজ্ঞানে স্বর্গলাভ করাকেই মহাপ্রস্থান বা ভৃগুপাত বলা হত।

পথের শেষে পুল। পাণ্ডারা বলেন—মা ও ছেলে যদি একসঙ্গে কেদারনাথ দর্শনে আসনে, তবে মাকে প্রথম এই পুল পেরুতে হয়।

পুলের ওপারে বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে। প্রথম ঘরখানির খোলা বারান্দায় একটা আলো জ্বলছে। জোরালো আলো পেট্রোম্যাক্স অনেকখানি জায়গা আলোকিত করে রেখেছে। আলো এসে পড়েছে পুলের ওপর। আমরা পুল পেরিয়ে এলাম।

কিছুক্ষণ থেকেই নিঃশব্দে পথ চলছিলাম। এমনিতেই ঠাণ্ডার জন্য কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তা ছাড়া কথা না বলে যতটা পারা যায় দেখে নেওয়াই উচিত। তীর্থের নিয়ম মত কেদারনাথে আমরা থাকব তিনদিন। দেবভূমিকে দর্শন করব নানাভাবে, নানা পরিবেশে,

নানা সময়ে। কিন্তু আলো-আঁধারী রাতে কেদারনাথের এই শান্ত সমাহিত ধ্যানমগ্ন ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপটি আর দেখা হবে না।

আমাদের পথ-প্রদর্শকই কথা বলল প্রথম, "বেটা পালিয়েছে।"

"কে?" আমার চমক ভাঙে।

"চৌকিদার। এই আলোর কাছে তার বসে থাকার কথা।"

"কেন?" রঞ্জন জিজ্ঞেস করে।

"রাতে কোন যাত্রী এসে পৌঁছলে তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য।"

পুল ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে এসেছি। পেট্রোম্যাক্সের আলোর শেষ রশ্মিটুকু হারিয়ে গেছে। পথের দুধারে বাড়ি-ঘর। কাঠ আর পাথরের বাড়ি। অধিকাংশ একতলা, তবে দোতলাও আছে। খোলা বারান্দার পরে দরজা। জানালা নেই বললেই চলে। কোন বাড়ি থেকে এতটুকু আলো এসে রাস্তায় পড়ে নি। এরা কি সবাই বাতি নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? রাত তো মোটে নটা।

আমরা একটা চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছি। "আপনি কোন্ দিকে যাবেন?" জিজ্ঞেস করি পথ-প্রদর্শককে।

বাঁদিকের রাস্তাটা দেখিয়ে বলে, "এই দিকে।"

কিন্তু চলতে থাকে ডানদিকে। কারণ বুঝতে না পারলেও চুপ করে থাকি। একটু বাদে সে-ই বলে, "চলুন, আপনাদের এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"কি দরকার? আমরা জিজ্ঞেস করে আস্তানা বার করে নেব।"

"কাকে জিজ্ঞেস করবেন?" হেসে ফেলে সে, "দেখছেন না, দোকান-পাট বাড়ি-ঘর সব বন্ধ। ধাক্কালেও কেউ এখন দরজা খুলবে না। এ তো আপনার কলকাতা নয় যে সারারাত রাস্তায় লোক চলবে।"

অবাক কাণ্ড! সে জানল কেমন করে যে আমরা কলকাতার লোক?" বোধ হয় চেহারা দেখে আর হিন্দী শুনে। কিন্তু কলকাতার

রাস্তায় যে সারারাত লোক চলাচল করে এ খবরটি তাকে কে দিয়েছে? কোন বাঙালী যাত্রী নিশ্চয়। তবে সত্যই পথ জনমানব শূন্য। রূপকথার রাজকন্যা আছে ঘুমিয়ে। রাক্ষসী শীত রয়েছে জেগে, তার হিংস্র থাবা বাড়িয়ে। রাজপুত্র সূর্য আসবে তার পবন-রথে। আসবে সে মন্দাকিনীর তীরে। রাক্ষসীর প্রাণ-ভোমরা মারবে পিষে। রাজকন্যা উঠবে জেগে। সূর্যকে বরণ করবে তার পরম-প্রিয় পতিরূপে। মৃত্যুপুরী পরিণত হবে জীবন্ত নগরীতে।

পথে মাঝে মাঝে বরফ দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এখনও বরফ পড়ে। শীতকালে প্রচণ্ড তুষারপাত হয় এখানে।

পাহাড়ের অতি অল্প অংশই দেখতে পাচ্ছি স্বল্প চাঁদের আলোয়। ওপরের দিকটা কেমন ধোঁয়াটে হয়ে আছে। তবে পাহাড়ের গায়ে যে বরফ জমে আছে, তা বেশ বুঝতে পারছি। বরফ লেগে আছে পথের দু-ধারের বাড়ি-ঘরে। লেগে আছে আমাদের জামা-কাপড়ে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে লোকটি বলে, "ঐ দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিন।"

সে ভুল করেছে। বলি, "আমাদের সহযাত্রীরা আগেই এসেছেন। তাঁরা গিরিজা পাণ্ডার বাড়িতে উঠবেন।"

সে হেসে ওঠে। আমি বিরক্ত হই। এখন আর হাসিঠাট্টা ভাল লাগছে না। একটুবাদে হাসি থামিয়ে সে বলে, "এটাই গিরিজা পাণ্ডার বাড়ি।"

আশ্চর্য! আমরা তো তাকে বলি নি। সে জানল কেমন করে? তবে কি সব বাঙালীরাই এখানে ওঠেন? কে জানে? আর জেনেই বা কি হবে? আস্তানায় পৌঁছে গেছি। বেঁচে আছি। কি আনন্দ! ছুটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিই। খুব জোরে—আরও জোরে।

'এল' ছাঁচে তৈরি দোতলা পাথরের বাড়ি। বড় রাস্তার ওপরেই একটা দরজা রয়েছে। কিন্তু লোকটি আমাদের পাঠিয়েছে গলির

মধ্যে। দু-বাড়ির মাঝখানে গলি। গলির দিকে পর পর তিনটি দরজা। লোকটি আমাকে মাঝখানের দরজায় ধাক্কা দিতে বলেছে। ধাক্কা দিচ্ছি যথাসাধ্য। সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। ঘুমিয়ে পড়ল না কি ?

"পূর্ণদা, গদাদা ! দরজা খুলুন, আমরা এসেছি।" আবার ধাক্কা দিই এবারে শুনতে পেয়েছে। দরজায় শব্দ হয়। নড়ে ওঠে। খুলে যায়। এক রকম ধাক্কা দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়ি। বেঁচে গেলাম এ যাত্রা। অবিশ্যি নিশ্চয় করে বলা কঠিন। প্রাণ নিয়ে পৌঁছেছি বটে, কিন্তু নিমোনিয়ার হাত থেকে কি নিস্তার পাব ?

দরজাটা বন্ধ করে দেন গদাদা। তাঁর হাতে একটা প্রদীপ। নিশ্চিদ্র ঘর, কাজেই কেরোসিন অচল। প্রদীপ উঁচু করে গদাদা আমাদের দেখলেন ভাল করে। রঞ্জন জিজ্ঞেস করে, "এই কি আমাদের ড্রইংরুম ?"

"না। আইসরুম। যদিও কুলিরা বেডরুম বানিয়েছে। ঐ দেখ না বাবুরা কি রকম গভীর নিদ্রায় অচেতন। তোমাদের হাঁক-ডাক তাদের কানে ঢোকে নি।"

সমীর এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ায়। বলে, "যাক্ আপনারা এসে গেছেন। কি চিন্তাতেই ফেলেছিলেন ! ভেতরে আসুন।"

আমরা বড় ঘরে ঢুকতে যাই, কিন্তু গদাদা বাধা দেন, "বললাম না এটা আইসরুম, তোমাদের জামাজুতোয় বরফ রয়েছে। এখানে ঝেড়ে নাও।"

ওয়াটারপ্রুফ খুলে ফেলি। প্যান্ট ঝেড়ে জুতো মুছে বড় ঘরে ঢুকি। বড় ঘর, খুব বড় নয়—মাঝারী। কোনমতে চারখানা কম্বল পাতা হয়েছে। তার বেশী দরকারও নেই। আমাদের তিনজনের আলাদা বিছানা। সমীর পূর্ণদার সঙ্গেই ঘুমোয়। কারণ ঘুমের প্রস্তুতিস্বরূপ ওদের দুজনের ঝাড়া একঘণ্টা জোরালো তর্ক করতে হয়। আজকের পালা শেষ হয়ে গেছে। পূর্ণদা গভীর ঘুমে অচেতন। এখন খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেলেও তিনি টের পাবেন না। ঘরের একপাশে

আমাদের মালপত্র। আরেক পাশে ফায়ার প্লেস। আগুন জ্বলছে। ছুটে যাই আগুনের ধারে। ইচ্ছে হচ্ছে আগুনে ঝাঁপ দিই। কিন্তু··· ছি ছি! যার সাহায্য না পেলে এই আগুনের কাছে এসে দাঁড়াতে পারতাম না—সে যে এখনও দাঁড়িয়ে। লোকটিকে ভেতরে এনে একটু যত্ন করা উচিত, নিদেনপক্ষে এক কাপ চা—শত হলেও তো মানুষ।

ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে টর্চ হাতে সমীরের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি। বেজায় ঠাণ্ডা। এখন যেন আরও বেশি লাগছে।

কিন্তু কোথায়? কেউ নেই। যতদূর দৃষ্টি চলে জনহীন পথ। মন্দাকিনীর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। নেই সেই বোঁচকা কাঁধে নাতিদীর্ঘ লোকটি। নেই সেই সেফ্‌টিল্যাম্পের ক্ষীণশিখা—জীবনের দীর্ঘতম দু-ঘণ্টা যে আমাদের জীবন-শিখা হয়ে ছিল।

অন্যায় করেছি। ভেতরে ঢোকার আগে তাকে ডেকে নেওয়া উচিত ছিল। সে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের এই অভদ্র আচরণে।

কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে সে গেল কোথায়? দরজা খোলার পর পর্যন্ত তাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। মোটে তো মিনিট তিনেক আমরা ভেতরে ছিলাম। এরই মধ্যে এ-পথে অদৃশ্য হওয়া তো সম্ভব নয়। রাস্তাটা এখানে মোটামুটি সোজা। অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আর কিছু না হক আলোটা তো দেখা উচিত। বুদ্ধি দিয়ে জগতে সব ধাঁধার উত্তর মেলে না। যুক্তি দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয় না। এসেছিল অকস্মাৎ, একান্ত অসময়ে, নিতান্ত প্রয়োজনে। প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতেই কি চলে গেল আমাদের ছেড়ে—একেবারে নিঃশব্দে?

## ॥ তিন ॥

রাত পোহাল। কিন্তু ফর্সা হল না। ঘরের ভেতর ফর্সা হবার উপায় নেই। ঘুম ভেঙেছে পাশের ঘরের যাত্রীদের কোলাহলে। ঘুম ভেঙেছে আমার, রঞ্জনের গদাদা ও পূর্ণদার। পূর্ণদা চেঁচিয়ে ওঠেন —যেন ভূত দেখেছেন, "আরে তোমরা! কখন এলে? কোথায় ছিলে সারারাত?"

"আপনার পদতলে।"

"রসিকতা ছাড়। যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।"

"আঃ কি চেঁচামেচি শুরু করলেন পূর্ণদা? একটু ঘুমুতেও দেবেন নাঃ?" সমীর প্রতিবাদ করে ওঠে। তার ঘুম ভেঙে গেছে।

"আর কত ঘুমোবে। এইবার চোখ ধুয়ে চায়ের ব্যবস্থা কর।"

"তা বৈকি। সন্ধ্যে না হতেই কম্বলের তলায় ঢুকে নিজের ঘুমটি পুষিয়ে নিয়েছেন কিনা?"

"বেশ করেছি। তোমার আমার বয়স এক?" অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ একটা কথা বলতে পেরে নিরাপদ বোধ করছেন পূর্ণদা। তাই একটু থেমে নিয়ে ধীরে সুস্থে আবার পুরনো কথায় ফিরে এলেন, "তারপর মহারাজ! তোমরা এই সাতসকালে কোথা থেকে উদয় হলে?"

সমীরের সঙ্গে আমরাও সজোরে হেসে উঠি। পূর্ণদা গম্ভীর হলেন। তিনি রেগে গেছেন। যে রকম কটমট করে তাকাচ্ছেন, তাতে ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। কেদারনাথের প্রথম দিন —ঝগড়াঝাঁটি দিয়ে উদ্বোধন করা ঠিক হবে না।

বলি, "আমরা কাল রাতেই এখানে এসেছি। আপনি তখন···"

আমার কথা কেড়ে নিয়ে সমীর সুর করে শুরু করে,

"স্বপন ঘুমে মগন ছিলেন শতেক লেপের তলে
চেতনাটুকু হারিয়েছিলেন অগ্নিশিখার ধারে।"

কুলিরা চা ও খাবার কিনে নিয়ে এল। চা বানাবার সব সরঞ্জামই আমাদের সঙ্গে আছে। হাতমুখ ধোবার জন্য ফায়ারপ্লেসে জলও গরম হয়েছে। তবু আর হাঙ্গামা বাড়ালাম না। দোকানের চা খেয়েই বেরিয়ে পড়া গেল।

বেলা কম হয় নি। আটটা বাজে। রাস্তার চেহারা দেখে কিন্তু বোঝার উপায় নেই। লোক চলাচল এখনও আরম্ভ হয় নি বলা চলে। অধিকাংশ বাড়ি-ঘর ও দোকান-পাটের দরজা বন্ধ। শীত কমেছে কিনা জানি না তবে কাল রাতের মত অত শীত লাগছে না। কাল মনের উত্তাপ কমে গিয়েছিল, আজ স্বভাবতই সেটা বেড়েছে। চারিদিকে ঘন কুয়াশা। একটু দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। কেদারনাথের সূর্য শুনেছি নবাবপুত্তুরকেও হার মানায়। মর্জিমাফিক এক-আধবার এক-আধ ঘণ্টার জন্য দর্শন দেয়। আর মর্জি না হলে দিনের পর দিন তার টিকিটি দেখা যায় না।

প্রায় এক বর্গ মাইল বিস্তৃত প্রস্তরময় ঊষর উপত্যকা। আকারে অনেকটা চায়ের পেয়ালার মত—প্রায় গোলাকৃতি। ৩০°৪৪´১৫´´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৯°৬´৩৩´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এই উচ্চতায় এতবড় উপত্যকা বিস্ময়কর।

উপমন্যুর নির্বাচন দক্ষতাকে প্রশংসা করতে হয়। সত্য যুগে মহাত্মা উপমন্যু শিবের তপস্যা করেছিলেন এখানে। তপোমুগ্ধ শিব সেই থেকে বিরাজ করছিলেন কেদারনাথে। ত্রেতাযুগে শিব শুনতে পেলেন পঞ্চপাণ্ডব তাঁর দর্শন লাভ করতে আসছেন। পাছে ভাতৃ-হত্যাকারীদের দর্শন দিতে হয়, তাই তিনি মহিষাকার শিলারূপ ধারণ করে আত্মগোপন করলেন। কুরুক্ষেত্রবিজয়ী বীরগণ শেষ পর্যন্ত এসে উপস্থিত হলেন এখানে। অগত্যা শিব পাতালপ্রবেশে উদ্যত হলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হতে পারলেন না। ভীম পেছন থেকে ছুটে এসে জাপটে ধরলেন তাঁকে। পাতালপ্রবেশ বন্ধ হল। পাণ্ডবদের ভক্তিতে ভুলে ভোলানাথ তাঁদের ক্ষমা করলেন। পঞ্চপাণ্ডব ভাতৃহত্যার

পাপমুক্ত হলেন। তাঁরা বৃষরূপী সেই শিলাকে কেন্দ্র করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। অনন্তকালের মুক্তি ক্ষেত্রে পরিণত হল কেদারনাথ।

উপত্যকার প্রায় মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে মন্দাকিনী—দক্ষিণ-প্রবাহিণী। শীর্ণকায়া কিন্তু মাতঙ্গিনী। স্বর্গবারি নিয়ে যাচ্ছে মর্ত্তলোকে। যাচ্ছে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হতে, গঙ্গোদকে গাঙ্গেয় ভূমিকে বিগলিত করতে।

মন্দাকিনীর পূর্বতীরে মন্দির ও লোকালয়। পশ্চিম তীর বসতিহীন। তিনদিক জুড়ে তুষারাচ্ছাদিত সুমেরু পর্বতমালা। শীতকালে এই পর্বতমালা থেকে তুষারের প্রবাহ নেমে এসে সারা উপত্যকাকে তুষারাবৃত করে ফেলে। প্রায় পনেরো ফুট বরফ পড়ে। কোন কোন বছর আরও বেশি - পুরো মন্দিরটি তলিয়ে যায় তুষারের তলে। কিন্তু মন্দির শীর্ষের ত্রিশূলটিকে তুষার কখনই ঢেকে ফেলতে পারে না। মে মাসের প্রথম দিকে সেই বরফ কাটা শুরু হয়। শেষ হলে ঘোষণা করা হয়—'মন্দির উন্মুক্ত'। আগে টিহ্‌রীর রাজা উপস্থিত থাকতেন এই উদ্বোধন উৎসবে। তিনিই প্রথম দর্শন করতেন করুণাময় কেদারনাথ।

চারিদিকের পাহাড়ের তুষার নিসৃত জলধারা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চ গঙ্গা—অলকানন্দা (অদৃশ্য), মন্দাকিনী দুধগঙ্গা ক্ষীরগঙ্গা (চোরাবারিতাল) ও মৌগঙ্গা। প্রাচীন কালে নাকি দুধগঙ্গার জল ছিল দুধের মত সাদা, ক্ষীরগঙ্গার জল ক্ষীরের মত সুস্বাদু ও মৌগঙ্গার জল মধুর মত মিষ্টি। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

ঐ জলধারা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চকুণ্ড—উদককুণ্ড রেতসকুণ্ড অমৃতকুণ্ড ঈশানকুণ্ড ও হংসকুণ্ড। পুণ্যার্থীদের অবশ্য দর্শনীয় এই পঞ্চকুণ্ড। তাই তাঁরা পাণ্ডাদের সঙ্গে জনপদ ছাড়িয়ে চলে যান উপত্যকার পূর্ব প্রান্তে। প্রতি কুণ্ডের পাশে বসে মন্ত্রপাঠ করেন।

এদের মধ্যে উদককুণ্ডই নাকি পুণ্যতম ধারা। এখানে মন্ত্রপাঠ করে পাণ্ডাদের দক্ষিণা দিলে কতটা পুণ্য সঞ্চয় হয় জানি না, তবে উদককুণ্ডের বৈশিষ্ট আছে। সর্বদাই তার বুকে বুদ্বুদ উঠছে। পাণ্ডারা বলেন—বাবা কেদারনাথের মহিমা। বিজ্ঞানীরা বলেন—এই জলে পারদ মিশ্রিত আছে। পুণ্যার্থীরা কিন্তু পরম ভক্তিভরে পান করেন এই পুণ্যবারি। শিশি ভরে নিয়ে যান ঘরে। দুর্গম তীর্থের পরম সঞ্চয় হয়ে থাকে সেই কুণ্ডবারি।

পুণ্যার্থীদের পঞ্চগঙ্গায় স্নান ও তর্পণ সেরে, হংসকুণ্ডে শ্রাদ্ধাদি করে, মন্দিরে আসতে হয়। পঞ্চগঙ্গার জল দিয়ে কেদারনাথ শিলাকে স্নান করিয়ে, বেলপাতা ও চন্দন দিয়ে করুণাময় কেদারনাথের পুজো করতে হয়। দর্শন শেষে এখানে এসে, উদককুণ্ড ও রেতসকুণ্ডের জল স্পর্শ করে, প্রথমেই বলে নিতে হয়—এই জল স্পর্শের ফলে দেহ পাপমুক্ত হল। তারপরে বার, তিথি ও মাস উল্লেখ করে বাঁ হাতে অঞ্জলি ভরে তিনবার জলপান করে বলতে হয়—

অহং ব্রহ্মঃ অহং বিষ্ণুঃ অহং রুদ্রঃ প্রজাপতিঃ।
মত্তুল্য সর্ব্বতীর্থানি নাস্তীব দেবদানবে॥

এইভাবে পরিক্রমা পূর্ণ করলে হৃদয়ে শিবলিঙ্গ জন্মায়। ফলে যেখানেই মৃত্যু হক, কাশীতে দেহরক্ষার ফল লাভ হয়।

মহাপন্থের পেছনে মহাগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে কেদারনাথ পর্বত (২২৭৭০´)। তার দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে নেমে এসেছে কালীগঙ্গা বা চোরাবারি হিমবাহ। এই হিমবাহের শেষ প্রান্তে চোরাবারিতাল বা গান্ধী সরোবর—অলকানন্দার উৎস। মন্দির থেকে দূরত্ব মাইল তিনেক। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জুন এই স্বর্গীয় সরোবরে মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র চিতাভস্ম বিসর্জন দেয়া হয়েছে।

কেদারনাথ পর্বতের পশ্চিমে কীর্তিস্তম্ভ (২০৫৭০´) ও ভারতখুণ্টা (২১৫৮০´), পূবে খর্চাকুণ্ড (২১৬৯৫´), সুমেরু পর্বত (২০৭৭০´) মন্দানী (২০৩২০´) ও চৌখাম্বা (২৩৪২০´)। চৌখাম্বা থেকে নেমে

এসেছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ—পূব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে কেদারনাথ পর্বতের কাছে এসে বাঁক নিয়েছে উত্তরে, শেষ হয়েছে ভাগীরথীর উৎস গোমুখীতে। চৌখাম্বার অপর প্রান্ত থেকে নেমে গেছে সতোপন্থ হিমবাহ—অলকানন্দার উৎস। একই হিমবাহ অঞ্চলের তিন প্রান্ত থেকে সৃষ্টি হয়েছে তিনটি নদী—ভাগীরথী মন্দাকিনী ও অলকানন্দা। মানুষের মুক্তির প্রয়োজনে তারা আবার পরিণত হয়েছে একটি ধারায়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পরম প্রতীক এই মিলিত ধারা—গঙ্গা।

আবার এই একই হিমবাহ অঞ্চলের তিন প্রান্তে তিনটি তীর্থ—ব্রহ্মা-তীর্থ গঙ্গোত্রী, বিষ্ণু-তীর্থ বদ্রীনাথ, মহেশ্বর-তীর্থ কেদারনাথ। প্রকৃত দূরত্ব বেশী নয়। কেদারনাথ থেকে গঙ্গোত্রী বিশ মাইল, বদ্রীনাথ ছাব্বিশ মাইল। কিন্তু সে পথ বড়ই দুর্গম, পেরোবার উপায় নেই। তাই তিন শ মাইলের ওপর চড়াই উতরাই ভেঙে এই পরিক্রমা পূর্ণ করতে হয়।

কেদারনাথ শৃঙ্গ বিশ্বের অন্যতম দুর্গম শৃঙ্গ! কিন্তু অজেয় নয়। ১৯৪৭ সালে আঁদ্রে রশ-এর নেতৃত্বে এক সুইস অভিযাত্রীদল এই দুর্গম শৃঙ্গ জয় করেছেন। গৌরবের কথা ভারতের বিখ্যাত পর্বতারোহী তেনজিং নোরগে শিখর বিজয়ীদের অন্যতম। কিন্তু তিনি এই দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাঁর সর্দার (টাইগার) ওয়াংদি নরবুর দুর্ভাগ্যের বিনিময়ে। এই অভিযাত্রীদলে মিসেস এ্যানেলিস লোহ্‌নার (এখন মিসেস সাটার) নামে একজন মহিলা সদস্যা ছিলেন। তাঁকে দেখাশুনো করার জন্যই নিযুক্ত হয়েছিলেন তেনজিং।

শিখর অভিযাত্রীরা চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য রওনা হয়ে গেলেন। তেনজিং মিসেস লোহ্‌নারের সঙ্গে শেষ শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাঁদের বিদায় অভিনন্দন জানালেন। বিজয় অভিনন্দন জানাবার প্রতীক্ষায় রইলেন।

কিন্তু সন্ধ্যের আগেই পরাজিত ও আহত অভিযাত্রীরা ফিরে এলেন!

তাঁরা জানালেন—নরবু ও এ্যালফ্রেড সাটার ছিলেন একই দড়িতে। শিখরের কাছে গিরিশিরার ওপর থেকে হঠাৎ ওরা দুজনে প্রায় হাজার ফুট নিচে গড়িয়ে পড়েন। নরবুর একখানি পা ভেঙে গেছে। আরেকখানিও সাটারের ক্র্যামপনের খোঁচা লেগে জখম হয়েছে। দুজনেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তবু সাটার কোনমতে হেঁটে আসতে সক্ষম হয়েছেন। নরবুকে বয়ে আনা সম্ভব হয় নি ওদের। সেখানেই একটি তাঁবু খাটিয়ে তাঁকে রেখে এসেছেন।

স্বাভাবিক ভাবেই তেনজিং ছিলেন সবার চেয়ে সুস্থ। তাঁরই ওপর নরবুকে নিয়ে আসার ভার পড়ল। এই অসাধ্য সাধন করলেন তেনজিং। শুধু তাই নয় নরবুকে আত্মহত্যার হাত থেকেও রক্ষা করলেন। সঙ্গীরা তাকে ফেলে চিরদিনের মত চলে গেছে ভেবে অপ্রকৃতিস্থ নরবু তুষার গাঁইতি দিয়ে নিজের গলা কাটছিলেন। এই সময় তেনজিং সেখানে উপস্থিত হলেন। পরদিন তিনি তাঁকে বয়ে নিয়ে এলেন নিচে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হল মুসৌরীতে।

অনিবার্যভাবেই নরবুর স্থলাভিষিক্ত হলেন তেনজিং। তিনি আঁদ্রে রশ, এ্যালফ্রেড সাটার, রেনে ডিটার্ট ও এ্যালেক্স গ্র্যাভেন-এর সঙ্গে আরোহণ করলেন এই দুর্গম শৃঙ্গ। তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। তিনি নিজেই বলেছেন, 'It was a great honour. To be a Sirdar is the ambition of every Sherppa, a turning point in his life···For, inspite of all the years I had climbed and the heights to which I had gone, this was the first time I had ever actually reached the top of a big mountain.'

এই সাফল্যই ভবিষ্যতে তেনজিংকে এভারেস্ট বিজয়ের সুযোগ এনে দিয়েছে। করুণাময় কেদারনাথ।

পঞ্চকুণ্ড দর্শন করে আমরা উঠে এলাম ওপরে। কেদারনাথের

লোকালয়ে—দেবালয়েও বলা যেতে পারে। মানুষের জন্যই তো দেবতা। তাই মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই জনপদ। সব মিলিয়ে শ খানেক বাড়ি। টিন কাঠ ও পাথরের তৈরি। মাঝে মাঝে সরু সরু উঁচুনিচু গলি—সব গিয়ে মন্দিরে মিশেছে। মনে পড়ছে কাল রাতের সেই পথ-প্রদর্শকের কথা, 'যাবার জায়গা এখানে একটাই--বাবা কেদারনাথের পদতলে।'

যাত্রীদের স্থানাভাব হয় না কেদারনাথে। এখানে রয়েছে পাণ্ডাদের বাড়ি—রয়েছে সরকারী বিশ্রাম ও নিরীক্ষণ ভবন। আর রয়েছে মন্দির সমিতি, কালিকমলী ও নেপালের মহারাজার ধর্মশালা। ভারতের খুব কম তীর্থেই নেপালী ধর্মশালা আছে।

কুমায়ুনীদের গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে ১৭৯০ সালে নেপালীরা কুমায়ুন জয় করে। ১৮০৩ সালে তারা গাড়োয়াল আক্রমণ করে। এক বছর ধরে যুদ্ধ চলে। তার পরে নেপালীরা গাড়োয়াল অধিকার করে নেয়। কিন্তু হত্যা ও লুটতরাজ চলতে থাকে। জনসাধারণ নেপালী শাসকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। নেপালীরা এই সময় কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে কিন্তু কেদারনাথ মন্দিরের কোন ক্ষতি করে নি। বরং তারা এই মন্দিরের সংস্কারসাধন করেছে। সেদিন নেপালীরা সেই সংস্কার না করলে, আজ হয়তো কেদারনাথ মন্দির এমন অক্ষত থাকত না।

কেদারনাথে এখন খাবার কিনতে পাওয়া যায়, রান্নার প্রয়োজন নেই। আছে দাতব্য চিকিৎসালয়। যাত্রীদের যা কিছু দরকার—সবই আছে এখানে। কিন্তু এ থাকা চিরস্থায়ী নয়। যাত্রা শেষ হতেই দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে যায়। হবেই বা না কেন? তখন যে এখানে কেদারনাথ একা থাকবেন। তাঁর তো ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই, রোগ শোক নেই, সেবকেরও প্রয়োজন নেই। তিনি যে স্বয়ম্ভু।

কিন্তু মানুষ তো দেবতাকে ভুলে থাকতে পারে না। তাই শীতের ছ মাস উখীমঠে মান্ধাতার মন্দিরে কেদারনাথের পুজো হয়। দূর

থেকে প্রণতি জানানো হয় বলেই হয়তো স্বয়ং রাওয়ালজী এই পুজোয় পৌরোহিত্য করেন।

রাওয়ালজী কেদারনাথের প্রধান পূজারী। কিন্তু বদ্রীনাথের রাওয়ালজীর মত তিনি কখনই কেদারনাথ মন্দিরের পুজো পরিচালনা করেন না। উখীমঠ কেদারনাথ মন্দির সমিতির প্রধান কার্যালয়। রাওয়ালজী সেখানেই থাকেন। বর্তমান রাওয়ালজী কর্নাটকের লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের বীরশৈব বংশীয় জঙ্গম গোস্বামী। তিনি বদ্রীনাথের রাওয়ালজীর মত নাম্বুদ্রী বংশীয় নয়।

আমরা এগিয়ে চলি মন্দিরের দিকে।

এ দিকটায় মনে হচ্ছে লোকবসতি বেশী। দুদিকে সারি বেঁধে পাণ্ডাদের বাড়ি। তার পর বাজার। সেই আদি অকৃত্রিম বাজার। হরিদ্বার, কাশী এমন কি কালীঘাটের সঙ্গে মিল রয়েছে। তবে আয়তনে খুবই ছোট, আয়োজনে তো বটেই। কেবল দু-একটি দোকানের ঝাঁপ খুলেছে। অনেক জিনিসই দেখছি এখানে পাওয়া যায়—জুতো, লাঠি-কম্বল, চাল-ডাল, আটা-চিনি, চা-দুধ। এক কথায় প্রয়োজনীয় সব কিছুই। প্রয়োজন বলতে এখানকার জীবনযাত্রায় যা লাগে, যে জীবনযাত্রা একান্তই এখানকার।

যত কথা শুনেছি, যত ছবি দেখেছি—সব যাচ্ছি ভুলে। সব ভুল। শুদ্ধ শুধু স্বর্গ।

কিন্তু স্বর্গ? সে তো কল্পনার কল্পলোক।

কে বলে কল্পনা? এই তো স্বর্গ। ওই তো অমরাবতী। সীমাহীন শুভ্র পাহাড়ের প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। জানি বলেই বলছি পাহাড়। দেখছি বিশাল ক্যানভাসে আঁকা একখানি ছবি।

ছবি? কিন্তু এ তো শিল্পীর কল্পনা নয়, এ যে বিশ্বকর্মার সৃষ্টি।

পাথরে বাঁধানো পথটি শেষ হয়েছে মন্দিরের সিঁড়িতে এসে। সিঁড়ির শেষে মন্দির প্রাঙ্গণ। নয় ধাপ সিঁড়ি। স্বর্গের সিঁড়ি—স্বর্গারোহিণী।

এখানে চারবেলা শুধু মেঘের খেলা। আলো আর আঁধারের আনাগোনা। মেঘ ঘন হচ্ছে, পাতলা হচ্ছে। রং পাল্টাচ্ছে—সাদা কালো সোনালী রূপালী। সূর্যকে দেখছি না অথচ মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে রোদের ঝিলিক। সূর্য আছে—কাছেই আছে। ধরা দিচ্ছে না, স্থায়ী হচ্ছে না।

স্থায়ী নয় কিছুই—সভ্যতা সমাজ সংস্কৃতি যৌবন—জীবন। অনিত্যের মধ্যে নিত্যের প্রতিভূ এই মন্দির। বিশ্বনাথের বিচিত্র মন্দির। যুগাতীত কাল ধরে প্রকৃতির প্রচণ্ড প্রলয় লীলাকে সংহার করে স্থাবর ব্রহ্মকরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

অভিনব এর গড়ন। গ্রীক-ভাস্কর্যের স্পষ্ট ছাপ এর সর্বাঙ্গে। শুধু চূড়াটি তিব্বতী। ভারতীয় মন্দিরশিল্পের প্রভাবমুক্ত। কবে নির্মিত হয়েছে, কেউ জানে না। কে নির্মাণ করেছেন তাও জানি না।

পাণ্ডাদের মধ্যেও এই নিয়ে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন--মধ্যম পাণ্ডব ভীম এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। আবার কেউ বা বলেন। অর্জুনের প্রপৌত্র জন্মেঞ্জয় এই মন্দির নির্মাণ করেছেন। কে এ নীরবতার অবসান করবে ?

আমরা কেদারনাথে আসি, বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করি। আনত হয়ে কেদারনাথ শিলাকে প্রণাম করি। তার পর ফিরে যাই ঘরে। মনেও আসে না—মৌর্যযুগে গ্রীক-গান্ধার ভাস্কর্য ভারতীয় মন্দিরশিল্পে এক নূতন ধারার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আক্রমণকারীদের ধর্মীয় তৎপরতার ফলে সে ধারায় নির্মিত কোন পূর্ণমন্দির আজ আর ভারতে নেই। তক্ষশিলায় ও পেশোয়ার অঞ্চলে শুধু কয়েকটি ভগ্নাবশেষ অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তার কোনটিরই উপরিভাগ অক্ষত নেই। ফলে গ্রীক-গান্ধার ভাস্কর্যের উদাহরণ সেই সব ভগ্নমন্দিরের স্তম্ভগুলিতেই সীমাবদ্ধ। মথুরা বেসনগর জালালাবাদ প্রভৃতি স্থানে গ্রীক প্রভাবান্বিত কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। পরধর্মবিদ্বেষীদের কবলে পড়ে মন্দিরগুলি নিশ্চিহ্ন

হয়ে গেছে। শুধু এই মন্দিরটি রয়েছে অক্ষত—কেদারনাথ যে অক্ষয় ও অব্যয়।

চূড়াটি দেখে মনে হচ্ছে প্রক্ষিপ্ত। ভারতীয় শিল্পে তিব্বতী ছাপ বড় একটা দেখা যায় না। বোধ হয় শঙ্করাচর্যের আগে যখন এই মন্দির বৌদ্ধমন্দির ছিল, তখন এই চূড়াটি তৈরি হয়েছে।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এই পুণ্যতীর্থ। পঞ্চ-কেদারের মধ্যমণি এই কেদারনাথ। বৃষরূপী শিবের পৃষ্ঠদেশ রয়েছে এখানে, বাহু তুঙ্গনাথে, মুখাবয়ব রুদ্রনাথে, জটা কল্পেশ্বরে ও নাভি মদমহেশ্বরে। দেহের বাকি অংশ রয়েছে পশুপতিনাথে, যদিও পশুপতিনাথ পঞ্চ কেদারের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মন্দিরের সামনেই নাদেশ্বর বৃষ-মূর্তি, পেছনে ভোগশালা, ঈশান কুণ্ড বা সুফল কুণ্ড। কুণ্ডের মধ্যে ঈশানেশ্বর শিবলিঙ্গ। মন্দিরের পশ্চিমে প্রধান পুরোহিত ও তাঁর সহকারীদের দোতলা বাড়ি। পশ্চিমে প্রধান মন্দিরের উত্তরে অমৃত-কুণ্ড ও নীলকণ্ঠ মহাদেব।

মন্দির দুটি অংশে বিভক্ত—নাটমন্দির ও গর্ভমন্দির। নাট-মন্দিরের দোরগোড়ায় গণপতির মূর্তি। ভেতরে ডান দিকে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী ও কুন্তী, বাঁ দিকে নরনারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ গরুড় ও পেতলের ষণ্ডমূর্তি।

নাটমন্দিরের শেষে আরেকটি দরজা পেরিয়ে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। দরজার ডানদিকে পার্বতী ও বাঁয়ে লক্ষ্মী-মূর্তি। গর্ভ-মন্দিরেই কেদারনাথ শিলা—পাণ্ডবদের পাপমুক্ত করেছিলেন বলে তিনি কৃতান্তনাথ।

সকাল সাড়ে আটটায় মন্দিরের দরজা খোলে, দশটার মধ্যেই পূজারতি শেষ হলে মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। বিকেল চারটেয় আবার মন্দির খোলে। অন্নপ্রসাদ দিয়ে ভোগ দেয়া হয়। বিশেষ দিনে হয় 'কড়ি' প্রসাদ—দইয়ে ভেজানো ছোলা ঘিয়ে ভাজা হয়।

মন্দিরের দরজা এখনও খোলে নি। তবে চৌকিদার এসে গেছে।

বৃষ-মূর্তির বেদীতে বসে চৌকিদার যাত্রীদের নাম লিখছে। যাত্রীরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন। এখনও যাত্রীদের সংখ্যা সামান্য। তবে মাঝে মাঝেই খুব হন্তদন্ত হয়ে দু-চারজন করে এসে পৌঁছচ্ছেন। বিনা প্রতিবাদে সকলের শেষে এসে লাইন দিচ্ছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সবচেয়ে বড় অবদান—'বুশ্‌কোট' ও কিউ। দুটোই আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। বুশ্‌কোট এখানে অচল কিন্তু 'কিউ' দিতে কারও আপত্তি নেই কেদারনাথে।

মন্দিরের ভেতরে জায়গা কম। প্রায় সবটা জায়গা জুড়েই ত্রিভুজাকৃতি কেদারনাথ শিলা। একসঙ্গে বেশী যাত্রী ঢুকলে অন্ধকূপ হত্যা হয়ে যাবে। কয়েকজন করে যাত্রীকে একবারে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়। তাঁদের প্রদক্ষিণ শেষ হলে পরের দলের পালা। তাই এই নাম লেখা, তাই এই কিউ।

আমরা এখন মন্দিরে ঢুকব না। কিউ পরে হবে, আগে চারদিকটা দেখে নিই ভাল করে। দেয়ালের কারুকার্য উল্লেখযোগ্য নয়। মাহাত্ম্য যাই হোক, আয়তনে বিরাট নয় এ মন্দির।

যাত্রীরা প্রদক্ষিণ করেন এই মন্দির। প্রণতি জানান কেদারনাথ-শিলাকে—আজ নয়, সেই কোন অনাদি অতীত থেকে। সকল ব্যবধান ভুলে ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সবাই এসে আমারই মত দাঁড়িয়েছেন এই ক্ষুদ্র মন্দির-প্রাঙ্গণে। কেন? কিসের আশায়?

আয়তন আর আড়ম্বর দিয়ে কি সব কিছুর বিচার চলে? সম্রাট তাঁর সিংহাসন ফেলে প্রাসাদ ছেড়ে নেমে এসেছেন পথে—নগ্নপদে ছুটে গেছেন নগরীর প্রান্তে—এক পর্ণকুটীরে। প্রণতি জানাতে তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে।

মাঝে মাঝেই মেঘ এসে চড়াও হচ্ছে—ঢেকে ফেলছে মন্দিরের চূড়া। ভিজে বাতাস, তাতে হাড়-কাঁপানো শীতের পরশ।

মন্দিরের পাশেই পোস্ট-অফিস। ছোট একখানি ঘর, পাথরের

দেয়াল, টিনের চাল, দরজা খোলা। কয়েকজন লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু ভেতরে কেউ নেই। পোস্টমাস্টারহীন পোস্ট-অফিস। কিন্তু মাস্টারমশাই না এলে দরজা খুলল কে।

"এসেছেন, বৈকি। ঐ যে দেখছেন না আগুন জ্বালাচ্ছেন।" একজন যাত্রী মাস্টারমশাইকে দেখিয়ে দেন।

মাংকি ক্যাপ ও ওভারকোট আবৃত একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আগুন জ্বালাচ্ছেন।

কিন্তু আগুন কেন? হয়তো কাজ শুরু করার আগে একটু হাত-পা সেঁকে নিতে চান। তা আগুন পেলে ভালই হয়। আমাদেরও শীত করছে। কিন্তু কেবল তো আগুন নয়। মাস্টারমশাই যে একটা পেতলের পাত্রে জল গরম করছেন। অতখানি জল দিয়ে কি করবেন? খদ্দেরদের চা খাওয়াবেন নাকি? কে জানে। কেদারনাথের পোস্ট-অফিস—হয়তো পোস্টকার্ড কিনলেই চা।

জিজ্ঞেস করতেই মাস্টারমশাই সহাস্যে জানালেন, "আর বলেন কেন? এক ফোঁটা জল নেই যে টিকিট লাগাবেন, খাম সাঁটবেন। তাই বরফ গলিয়ে জল তৈরি করছি। এটি কেদারধাম পোস্ট-মাস্টারের বাড়তি কাজ।"

জল তৈরি হল। আমরা চত্বরে বসে চিঠি লিখলাম—ডটপেন্সিল দিয়ে। ফাউন্টেন পেন এখানে অচল। চিঠি ডাকে দিয়ে আবার নেমে এলাম রাস্তায়।

এই সেই কেদারনাথ। সপ্তদ্বীপের রাজা কেদারের কেদারনাথ। বৃদ্ধ বয়সে রাজা কেদার পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে এখানে এসে তপস্যা করেন। তপস্যা সফল হল। তাঁর নাম থেকেই—কেদারখণ্ড নামের সৃষ্টি। রাজা কেদারের কন্যা বৃন্দা ছিলেন কমলার অবতার। ব্রহ্মচারিণী বৃন্দাও আজীবন তপস্যা করেছেন। বৃন্দার তপস্যাধন্য ভূমিই বৃন্দাবন। কোথায় বৃন্দাবন আর কোথায় কেদারনাথ! বৃন্দাবনের পিতৃভূমি কেদারনাথে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

"এই যে মহারাজ, কোথায় যাচ্ছেন ?" কয়েকজন যজমানকে নিয়ে গিরিজা পাণ্ডা মন্দিরে এসেছেন।

পূর্ণদা আমার হয়ে জবাব দিলেন, "যাচ্ছি ভগবান শঙ্করাচার্যের সমাধি দেখতে।"

"খুব ভাল। যান দেখে আসুন। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে ভগবান শঙ্করাচার্য এখানে দেহরক্ষা করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ থেকে ষোল হাজার টাকা ব্যয় করে ঐ সমাধি-মন্দির তৈরি করা হয়েছে।" আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের পেছনে আসেন পাণ্ডাজী। অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, "ঐ যে ইন্দ্রকিলা পর্বতের নিচে ভগবান শঙ্করের সমাধি-মন্দির দেখা যাচ্ছে।"

"ইন্দ্রকিলা পর্বত! যেখানে অর্জুন তপস্যা করেছিলেন।" জিজ্ঞেস করি পাণ্ডাজীকে।

"জী।"

পাণ্ডাজী দাঁড়িয়ে রইলেন মন্দিরের চত্বরে। আমরা নেমে এলাম নিচে। সামনে নয় ধাপ সিঁড়ি কিন্তু পেছনে সিঁড়ি নেই। সামনের দিকটা নিচু। জায়গাটা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে পাহাড়ে মিশেছে। একদিন অর্জুন এখানে এসেছিলেন ব্যাসদেবের পরামর্শে। শত্রুভয়ে ভীত যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব অভয় দিয়েছিলেন 'ভীষ্ম দ্রোণ ভুরিশ্রবা, কৃপ কর্ণ দ্রৌণির সর্বশাস্ত্র-বিশারদ হয়েও তুমি কেন বিচলিত হচ্ছ? অর্জুনকে ইন্দ্রকিলা পর্বতে পাঠাও, তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করুক সে। শিব সহায় হলে জয় অবশ্যম্ভাবী।'

অর্জুন এলেন এখানে। দেখা হল ইন্দ্রের সঙ্গে। সব শুনে ইন্দ্র বললেন, 'এখানেই যখন এসে পড়েছ, তখন আর অস্ত্র নিয়ে মর্তে ফিরে কি করবে? দেবত্ব নিয়ে স্বর্গ ভোগ কর।'

'ইন্দ্রপদ পেলেও চার ভাইকে ত্যাগ করতে পারব না দেবরাজ!' করজোড়ে অর্জুন জানালেন ইন্দ্রকে।

দেবত্বের চেয়ে ভ্রাতৃত্ব বড়, স্বর্গের চেয়ে মর্ত।

ইন্দ্রের অনুমতি পেয়ে অর্জুন শিবের তপস্যা শুরু করলেন। প্রথমে পক্ষকাল অন্তর গলিতপত্র খেতেন, পরে মাসে একবার, তার পর চার মাস বাদে, অবশেষে উর্ধ্ববাহু হয়ে এক আঙুলে দাঁড়িয়ে বায়ু সেবন করে রইলেন। তাঁর তপস্যায় তাপিত হলেন গন্ধর্বচারণসিদ্ধ মহাঋষিরা। শিবের শরণাগত হলেন তাঁরা। শিব বললেন, 'তোমরা নিশ্চিন্তে ফিরে যাও, আমি বর দিয়ে শান্ত করছি অর্জুনকে।'

মায়াবলে কিরাত ও কিরাত-গৃহিণীর রূপ ধারণ করে শিব ও শিবানী আবির্ভূত হলেন অর্জুনের সামনে। শিবের পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানে এল এক বরাহ। বরাহকে কেন্দ্র করে অর্জুন শিবের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন।

মহাভারতের এ অংশটুকু নিয়ে রচিত হয়েছে জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য। কেদারনাথের কাব্য—কিরাতার্জুনীয়ম্।

যুদ্ধশেষে মৃতপ্রায় হলেন অর্জুন। চেতনা লাভ করে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য মাটির শিবলিঙ্গ তৈরি করে পুজো করলেন। মালা দিলেন শিবলিঙ্গকে। সে মালা গিয়ে পড়ল কিরাতের কণ্ঠে। ভুল বুঝতে পারলেন অর্জুন। ক্ষমা প্রার্থনা করলেন কিরাতরূপী শিবের কাছে। দু-বাহু বাড়িয়ে শিব তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। বললেন, 'মানুষ তো দূরের কথা, দেবাসুরের সাধ্যাতীত কাজ করেছ তুমি। আমার সঙ্গে সমানে সংগ্রাম করেছ। আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দান করছি।'

দিব্যদৃষ্টি পেয়ে অর্জুন দর্শন করলেন শিব ও শিবানীকে।

এই সেই শিবের কেদারনাথ। দিব্যদৃষ্টি নেই তাই তাঁকে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা হলেও তিনি আছেন। আছেন মন্দিরে, আলোতে বাতাসে, পাহাড়ে প্রান্তরে। নাই বা পেলাম দিব্যদৃষ্টি, অনুভূতি তো লাভ করেছি। সমস্ত দেহ প্রাণ ও মন দিয়ে অনুভব করছি—তিনি আছেন। আছেন—

'অনলে অনিলে চির নভোনীলে,
ভূধর সলিলে গহনে,

বিটপীলতায়, জলদের গায়ে,
শশী-তারকায় তপনে।'

আছেন—আমাতে তোমাতে, নিরাকার পরম ব্রহ্মরূপে।

অনেক পেয়েছি। আর কিছুই চাই না করুণাময় কেদারনাথের কাছে। শুধু কামনা করি আমার এ সঞ্চয় যেন অক্ষয় হয়, যেন হারিয়ে না যায় মর্তের ধূলি-ধূসরিত পথে।

আবার এসেছি মন্দিরে। একটিই দরজা। ভেতরটা অন্ধকার—স্যাঁতসেঁতে। আয়তনে বড় না হলেও উল্লেখযোগ্য। শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য নয়। এ মন্দিরে মূল বিগ্রহের কোন মূর্তি নেই। তবে কি আছে?

আছেন শিলারূপী কেদারনাথ—নিরাকার পরম ব্রহ্মের প্রতীক। আছেন মন্দির প্রকোষ্ঠের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে—যাত্রীদের ঘৃত-সিঁদুরে স্নান করে।

সবার মত আমিও স্পর্শ করেছি তাঁকে। কল্পনা করেছি মহাবীর বৃকোদরের শক্তি, যিনি আপন বাহুবলে এই বিশাল বৃষরূপী শিবের পাতাল-প্রবেশ বন্ধ করেছিলেন। তবে এখনও একা দাঁড়িয়ে রয়েছি কেন? এদিক সেদিক তাকাচ্ছি কেন? কাউকে খুঁজছি কি?

হ্যাঁ, খুঁজছি সেই পথ-প্রদর্শককে। যে না হলে আমি আসতে পারতাম না কেদারনাথে, দাঁড়াতে পারতাম না এই মন্দিরতলে, স্পর্শ করতে পারতাম না এই শিলাকে।

সহযাত্রীরা সবাই ফিরে গেছে ঘরে, আর আমি ঘরছাড়া পাগলের মত মন্দিরের আনাচে-কানাচে খুঁজেছি তাকে। সে যে বলেছিল, তাকে মন্দিরেই পাওয়া যাবে। কোথায়?

মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করেছি তার কথা। তিনি হেসে উঠেছেন। তিনি কাউকে কিছু আনতে, কাল পাঠান নি রামওয়ারা চটিতে। প্রধান পুরোহিতের কথা তো আর অবিশ্বাস

করা যায় না।

কিন্তু সেই পথ-প্রদর্শককেই বা অবিশ্বাস করি কেমন করে? সে তো স্বপ্ন নয়, মায়া নয়। সে যে আলো হাতে, আঁধার রাতে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে কেদারনাথে। সে যে পরম করুণাময়। আমরা তাঁকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে চলেছি, কথা বলেছি। তাঁকে ভালবেসেছি, বিশ্বাস করেছি। চিরদিন করব, আজ খুঁজে না পেলেও।

# কর্ণধন্য কর্ণপ্রয়াগ

মানুষ মরণশীল। মহাভারতের মহারথীরাও মানুষ। তাঁরা মারা গেছেন। তবে তাঁরা কীর্তিমান, মরদেহ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুছে যান নি মানুষের মন থেকে। মহাকবির কল্পলোকে ঠাঁই পেয়েছেন। বেঁচে আছেন মহাকাব্যের পাতায়। বেঁচে আছেন—দুর্যোধন দুঃশাসন জয়দ্রথ। কিন্তু তাঁদের বাঁচা আর ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের বেঁচে থাকা এক নয়। এদের মধ্যে আবার কর্ণ আমাকে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করেন। ভালমন্দ মিলিয়ে কর্ণের মত বিচিত্র চরিত্র আমি আর মহাভারতে খুঁজে পাই না। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে আর কাকে তাঁর মা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন, সুতপুত্র বলে কাকে দ্রোণাচার্য শিষ্য বলে স্বীকার করেন নি, পরম সত্যবাদী হয়েও কে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে পরশুরামের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছেন, ন্যায় অন্যায় বিচার না করে অম্লানবদনে কে দুর্যোধনের সব অপকর্মের সহায়ক হয়েছেন? শত চেষ্টা করেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁকে দুর্যোধনের পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি, নিজের তিনটি ছেলে যুদ্ধে নিহত হবার পরে, নিজেকে অস্ত্রহীন জেনেও যিনি অবিচলিত ছিলেন—তিনিই বেদশাস্ত্র বিশারদ বসুষেণ। পরম দুঃখী হয়েও সর্বত্যাগী মহাবীর কর্ণ। তাই সহযাত্রীদের অনুরোধ ও উপদেশ উপেক্ষা করে বাস থেকে নেমে পড়েছি এখানে—এই কর্ণধন্য কর্ণপ্রয়াগে।

এখানে আধ ঘণ্টার জন্য বাস থামে। ঋষিকেশ-জোশীমঠ বাস পথে কর্ণপ্রয়াগ একটি ঘাট। সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ, কাজেই ওয়ান-ওয়ে-ট্রাফিক। কতগুলো জায়গা আছে যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে আপ ও ডাউন বাস পাস করানো হয়। এই জায়গাগুলোকেই ঘাট বলে।

কোন একদিকের বাস নির্দিষ্ট সময়ে ঘাটে না পৌছলে, আরেকদিকের বাসকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে হয় সেই ঘাটে।

সহযাত্রীরা বলেছিলেন, "দেখতে হয় এই আধ ঘণ্টার মধ্যেই চটপট দেখে নিন। কেন আবার এই পাণ্ডববর্জিত গণ্ডগ্রামের জন্য একটা দিন নষ্ট করবেন?"

ওরা আমার মত ভবঘুরে নয়, ওরা তীর্থযাত্রী। সময় ও অর্থের দাঁড়ি-পাল্লায় পুণ্য ওজন করে তীর্থ করেন। তাছাড়া কর্ণপ্রয়াগ তো পাণ্ডববর্জিত বটেই। কর্ণকেই বর্জন করেছিলেন পাণ্ডব-জননী কুন্তী। স্বভাবতই 'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষম্' সত্যটা পাণ্ডব-ভক্তদের কাছে আজও মিথ্যে। তাই কেদার-বদ্রীর মন্দির হরিজনদের কাছে উন্মুক্ত করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে।

পাহাড়ী জনপদ হলেও কর্ণপ্রয়াগ ঠিক পাহাড়ের ওপর অবস্থিত নয়। উচ্চতা মোটে ২৬০০ ফুট। ৩০° ১৫′ ৪৫″ উত্তর ও ৭৯° ১৫′ ২৯″ পূর্ব দ্রাঃ অবস্থিত। কাছাকাছি কোন উঁচু পাহাড় নেই। যে আছে সবই টিলা। বাস রাস্তাটাও এখানে তেমন উঁচুনিচু নয়।

কর্ণপ্রয়াগ দুভাগে বিভক্ত। মূল অংশ কর্ণগঙ্গার পশ্চিম তীরে—বাজার ধর্মশালা সদাব্রত চটি স্কুল ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হাসপাতাল, পশু-চিকিৎসালয় থানা সঙ্গম মন্দির ও বাস স্ট্যাণ্ড। পূর্ব পারে—পি. ডব্লু. ডি-র ডাকবাংলো, ডাক-তার ও টেলিফোন-ঘর আর ডেপুটি কালেক্টারের অফিস। নবগঠিত চামেলী জেলার কর্ণপ্রয়াগ একটি মহকুমা। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে একুশ মাইল। বাসে ঘণ্টাদুয়েক সময় লাগে।

কয়েক বছর আগে কর্ণগঙ্গার ১৮৪½ ফুট পুলটি ভেঙে যায়। ভাঙা পুলের থামগুলো কিন্তু এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বহু টাকা খরচ করে নতুন পুল তৈরি করা হয়েছে। না করে উপায় নেই। দেবপ্রয়াগ ও কীর্তিনগরের মত এ পুলটিও অপরিহার্য। ঋষিকেশ থেকে বাস-পথ গঙ্গার দক্ষিণ তীর দিয়ে এসে দেবপ্রয়াগে পেরিয়েছে

ভাগীরথী, কীর্তিনগরে অলকানন্দা, কর্ণপ্রয়াগে কর্ণগঙ্গা, নন্দপ্রয়াগে নন্দাকিনী, চামোলী ছাড়িয়ে বিরেহী গঙ্গা। এর কোন একটি পুল চালু না থাকলে মহাপ্রস্থানের পথ রুদ্ধ।

ঋষিকেশ থেকে শুরু হয়েছে তুটি পথ। গঙ্গার ডান তীর দিয়ে বাস-পথ। বাঁ তীর দিয়ে হাঁটা-পথ। স্বতন্ত্র তাদের সত্তা কিন্তু অভিন্ন তাদের উদ্দেশ্য। তাই তারা উভয় উভয়কে কাছে ডেকেছে, কিন্তু তুয়ের মাঝে ছিল নদীর ব্যবধান। কীর্তিনগরে এই ব্যবধান ঘুচেছে। নূতন শরণাগত হয়েছে পুরাতনের। বর্তমান হার মেনেছে অতীতের কাছে।

নদী পেরিয়ে বাস-পথ এসে মিলেছে পায়ে-চলা পথে। পথিকের কিন্তু ক্ষতিই হয়েছে এতে। এখন তাকে পথ ছেড়ে দিতে হয় যন্ত্র-দানবকে। ধূলি ঢোকে তার চোখে। সজল চোখে সে পথ চলে—লাঠি ভর দিয়ে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে। তার বাস-ভাড়া নেই, খাওয়ার খরচ নেই, শীতের পোশাক নেই। তবু সে যাবে। প্রণতি জানাবে করুণাময় কেদারনাথ ও বরণীয় বদ্রীনাথের পদপ্রান্তে। মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ—ভক্তির যে অভাব নেই তাঁর অন্তরে। ভক্তির ভেট নিয়ে ভক্ত চলেছে ভগবানের কাছে।

এ পথ ভারতের প্রাচীনতম তীর্থপথ। যুগাতীত কাল ধরে অগণিত ভক্তদল ভক্তির ডালি পূর্ণ করে এগিয়ে গেছেন তুর্গম বিপদ-সংকুল পথে। তাঁরা পথকষ্টে ব্যথিত হন নি, কিন্তু তাদের কষ্টে ব্যথিত হয়েছিলেন এক মহীয়সী মহিষী—রাণী অহল্যাবাঈ। তিনি সেদিনের সেই তুর্গম পাকদণ্ডীকে সুগম পায়ে-চলা পথে পরিণত করে দেন। রাণী অহল্যাবাঈয়ের অমর আত্মাকে প্রণতি জানাই।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর এ পথে বড় একটা চোখে পড়ে না। এখান থেকে মাইল ছয় আগে আমরা কিন্তু একটা সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখেছি—বাস-পথ ও অলকানন্দার মাঝখানে। জায়গাটার নাম গৌচর। তবে গৌচরে

এখন মানুষ চরে—চাষাবাদ হয়। কোন এক সময় হয়তো মানুষের প্রয়োজন হত না ঐ ভূখণ্ডের। তাই সে তাকে বিশ্বনাথের বাহনের জন্য বরাদ্দ করে দিয়েছিল। নাম রেখেছিল গৌচর। আজ মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, অভাব বেড়েছে। সে গরুর অধিকারে ভাগ বসিয়েছে।

এখন বিদেশীদের কাছে কর্ণপ্রয়াগ—উত্তরাখণ্ডের সীমারেখা। এখান থেকেই 'ইনার লাইন' শুরু। এই লাইন পেরোতে হলে তাঁদের স্পেশ্যাল পারমিট লাগে।

কর্ণপ্রয়াগ থেকে দুটি বাস-পথ শুরু হয়েছে। প্রথমটি গেছে লোহবা। সেখান থেকে হাঁটা-পথে গণাই। এই পথেও শিগগীরই বাস চলবে। গণাই থেকে বাস যায় রামনগর ও রাণীক্ষেত। দ্বিতীয়টি দিয়ে পৌঁছন যায় আলমোরা। পথে পড়ে থরালী ও গোয়ালদাম। গোয়ালদাম থেকে বাসে গরুড় ( বৈজনাথ ) ও বাগেশ্বর হয়ে যাওয়া যায় কাপকোট। কাপকোট থেকে ৩৬ মাইল হেঁটে পিণ্ডারী হিমবাহ* —কর্ণগঙ্গার উৎস। খুবই সহজ এবং সুন্দর পথ। তিন থেকে দশ মাইল অন্তর পথে পাঁচটি চমৎকার ডাকবাংলো আছে।

নন্দাদেবী-পূর্ব ( ২৪,৩৯১´ ) ও নন্দাকোট ( ২২৫১০´ ) পর্বত-নিঃসৃত হিমপ্রবাহ থেকে সৃষ্ট হয়েছে পিণ্ডারী হিমবাহ। দু মাইল দীর্ঘ ও চার শ ফুট প্রশস্ত এই হিমবাহটি বারো থেকে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু। ভারতের সুন্দরতম হিমবাহকটির অন্যতম। এই হিমবাহের ওপর দিয়েই বিখ্যাত ট্রেল্‌স গিরিবর্ত্মের ( ১৭৭০০´ ) পথ।

গোয়ালদাম থেকে ৪৩½ মাইল হেঁটে রূপকুণ্ডে (১৬৩০০´) পৌঁছন যায়। ত্রিশূল ( ২৩৩৬০´ ) পর্বতের পাদদেশে একটি বরফাবৃত হ্রদ। পাঁচ শতাধিক নরকঙ্কালকে বক্ষে ধারণ করে আজও সে অনুসন্ধিৎসু পর্যটকদের কাছে পরম রহস্যময় হয়ে আছে।

পিণ্ডারী হিমবাহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে কর্ণগঙ্গার কুমায়ুনী নাম পিণ্ডার নদী। গাড়োয়ালে প্রবেশ করেই সে হয়েছে পিণ্ডর গঙ্গা।

এখানে এসে কর্ণগঙ্গা। খুবই স্বাভাবিক। গঙ্গার দেশ গাড়োয়াল—দুধগঙ্গা, ক্ষীর গঙ্গা, মৌ গঙ্গা, অমৃত গঙ্গা, কেদার গঙ্গা, কালী গঙ্গা, ধৌলী গঙ্গা, জাড গঙ্গা, ধর্ম গঙ্গা, ঋষি গঙ্গা, বিষ্ণু গঙ্গা, গণেশ গঙ্গা, বিরেহী গঙ্গা, বাসুকী গঙ্গা, বাল গঙ্গা, ভৃগু গঙ্গা, ভুইন্দার গঙ্গা, রাম গঙ্গা, লক্ষ্মণ গঙ্গা, হনুমান গঙ্গা, ধিরতী গঙ্গা, আকাশ গঙ্গা, পাতাল গঙ্গা।

থরালির পথে ষোল মাইল গিয়ে কর্ণগঙ্গা পেরিয়ে দণ্ডাকার চড়াই। দু মাইল দীর্ঘ সেই চড়াই পেরিয়ে মহামৃত্যুঞ্জয় পর্বত। লোকালয়হীন এই পর্বতের ওপরে ছ হাজার ফুট উঁচুতে এক বিরাট শিব মন্দির আছে। বছরে একবার শুধু সেখানে লোক সমাগম হয়—শিবরাত্রিতে মেলা বসে মন্দিরের চত্বরে। মাহাত্ম্যের বিচারে এই মন্দিরের শিবলিঙ্গের স্থান নাকি কেদারনাথ শিলার পরেই। কথিত আছে শঙ্করাচার্য নিজে সেখানে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর নির্মিত মন্দিরটি ১৮০৩ সালের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। সেই মন্দিরের বেদীতেই বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ ক্রমেই কর্ণপ্রয়াগ সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন। সরু পাকদণ্ডীগুলো কোদাল-গাঁইতির স্পর্শলাভ করে সুগম হচ্ছে। কিছুদিন হল কর্ণপ্রয়াগে নলের জলের ব্যবস্থা হয়েছে। না, টালার মত ট্যাঙ্ক দেখতে পাবেন না এখানে। নল দিয়ে ঝরণা থেকে জল এনে সরবরাহ করা হয়েছে সর্বত্র। আমেদাবাদের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টার দানশীল পণ্ডিত গোপালশঙ্কর বেণীশঙ্কর ভবেচ স্থানীয় জনসাধারণের সুখ-সুবিধার কথা বিবেচনা করেই এই সুবন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু আধুনিকতার প্রলেপে কর্ণপ্রয়াগের বৈচিত্র্যকে মুছে ফেলেছেন। এখানে অলকানন্দা মোটেই অশান্ত নয়। অনায়াসে জলে নেমে স্নান করা যায়। কর্ণগঙ্গার কূলে বসে আঁজলা ভরে জল তুলে তৃষ্ণা মেটানো আর পথে দাঁড়িয়ে নলের জলে গ্লাস ভর্তি করে তাতে চুমুক দেয়া, এক কথা নয়।

কর্ণপ্রয়াগ জায়গাটা শহর হলেও শান্ত। শুধু ঘাটের সময় জম-

জমাট। দুদিক থেকে একই সময় প্রায় খান দশেক বাস আর খান বিশেক সরকারী ও বে-সরকারী গাড়ি এসে দাঁড়ায়। কর্ণপ্রয়াগের শান্ত ও মন্থর জীবনে সাময়িকভাবে দুর্দান্ত কর্ম-চাঞ্চল্য দেখা দেয়। হাত-পায়ের জড়তা ভাঙতে অধিকাংশ যাত্রীরাই নেমে পড়েন। ভারতের সমস্ত ভাষাই তখন কর্ণপ্রয়াগের ভাষা হয়ে দেখা দেয়। ভাষা-ভাষীদের নিয়ে দোকানীদের কাড়াকাড়ি।

বাস যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ এই কাড়াকাড়ি সমানে চলেছে। আমিও বাস স্ট্যাণ্ড থেকে নড়তে পারিনি। সহযাত্রীদের অনুনয় ও অনুযোগ নীরবে সইতে হয়েছে। তারপর এক শুভ মুহূর্তে আমাদের বাস ধুলো উড়িয়ে চলে গেল নন্দপ্রয়াগ তথা জোশীমঠের পথে।

আমিও নিষ্কৃতি পেলাম। এগিয়ে চললাম একটা চায়ের দোকানে। চা খেতে খেতে দোকানীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার কাছে মালপত্রটুকু জমা রাখতে হবে কিছুক্ষণের জন্য। সন্ধ্যে হতে এখনও দেরি আছে। আগে জায়গাটা দেখে নিই। তারপর কোন দোকান থেকে রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে একেবারে ধর্মশালায় গিয়ে শয্যা নেব। এখানে চটি আছে অনেক কিন্তু চটিতে ঠাঁই নিতে নিষেধ করেছেন সবাই।

কোন এক সময় কর্ণপ্রয়াগে অগণিত যাত্রীর সমাগম হত। তখনও বাসের প্রচলন হয় নি। যাত্রীরা রামনগর বা রাণীক্ষেত থেকে পায়ে হেঁটে এখানে আসতেন। এখান থেকে বদ্রীনাথ যেতেন। তখন যাত্রীদের দু-একটা দিন কাটাতে হত এখানে। ফলে কর্ণ-প্রয়াগ বেশ জমজমাট ছিল। দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তার। লাহোরের ট্রিবিউন ও কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা এখানে আসত নিয়মিত। আশি বছর আগেও এখানে বাজার দাতব্য-চিকিৎসালয় ও পুলিস চৌকি ছিল।

বাসের আগমনে কর্ণপ্রয়াগের মূল্য গেছে কমে। এখানে দিনের বাস যাত্রীদের মেয়াদ আধ ঘণ্টা। শুধু সন্ধ্যের দিকে যে কটি বাস

এসে পৌঁছয়, তাদের যাত্রীরাই এখানে রাত কাটায়। চটিওয়ালাদের এখন বড়ই দুরবস্থা। ফলে যাত্রী পেলে কৌশল করে তারা নাকি অবস্থা ফেরাতে চেষ্টা করে। অতএব কালিকমলীর ধর্মশালার মত নিরাপদ আশ্রয় আর নেই এখানে।

দান ধ্যান ও সেবা। এই তিন নিয়ে ভারতের ধর্ম। সূর্যের সাবধান বাণী গ্রাহ্য না করে দাতাকর্ণ কবচকুণ্ডল দান করে মরণকে বরণ করেছিলেন। সূর্যের ধ্যান না করে জল গ্রহণ করতেন না তিনি। অতিথিসেবার প্রয়োজনে পুত্র হত্যা করতে কুণ্ঠিত হন নি কর্ণ। অথচ সেই কর্ণের স্মৃতিধন্য কর্ণপ্রয়াগের চটিওয়ালারা আজ সেবাব্রত বিসর্জন দিয়েছে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি থাকতে পারে! দুর্ভাগ্য কর্ণপ্রয়াগের নয়, আমাদের। আমাদের এই দরিদ্র দেশের।

চা খেয়ে দোকানীর কাছে জিনিসপত্র জমা রেখে রওনা হলাম সঙ্গমের দিকে। বাজার থেকে সঙ্গম প্রায় আধ মাইল। কর্ণগঙ্গার পাশ দিয়ে পথ। পাথুরে পথ। পরিষ্কার পথ। নির্জন পথ।

সঙ্গমের ঠিক ওপরেই কর্ণ গঙ্গার তীরে কর্ণমন্দির। পুরনো কিন্তু জীর্ণ নয়। মহাকালের অমোঘ বিধানে কর্ণ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। নবম শতাব্দীতে সেই বেদীমূলে শঙ্করাচার্য নতুন মন্দির তৈরি করান। সেই থেকে নিয়মিত সংস্কারের ফলে মন্দিরটি আজও অক্ষত রয়েছে। ভেতরে অঙ্গরাজ কর্ণ ও রাজমহিষী পদ্মাবতীর প্রস্তরমূর্তি। রাজারাণীর গায়ে কিন্তু রাজবেশ নেই। আগে ছিল। নেপালী যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত হয়েছে। ঠিকই হয়েছে। অধিরথপুত্র রাধেয়—তাঁর গায়ে অলংকার থাকবে কেন?

মন্দিরের কাছেই সূর্যকুণ্ড কর্ণকুণ্ড আর উমাদেবীর প্রাচীন মন্দির উমেশ্বর মহাদেব। এ না হলে আর ভোলানাথ! গিন্নীর পরিচয়ে পরিচিত হয়েও খোশমেজাজে অধিষ্ঠিত আছেন!

আরেকটু এগিয়েই রক্তবর্ণ বিনায়ক শিলা। স্পর্শ করলে সর্ববিঘ্ননাশ হয়—প্রদক্ষিণ করলে তো কথাই নেই। প্রদক্ষিণ করব কি? কি

হবে ? মহাবীর কর্ণ নিশ্চয়ই বহুবার স্পর্শ করেছেন—প্রদক্ষিণ করেছেন এই শিলা। কিন্তু কোথায় ? তিনি তো কোন চক্রান্তের কবল থেকে পরিত্রাণ পান নি।

সস্ত্রীক কর্ণ গিয়েছিলেন কৈলাসে—শিবক্ষেত্রে। শিবানী তাঁদের পেয়ে খুব খুশী হলেন—আশ্রয় দিলেন, যজ্ঞের ব্যবস্থা করে দিলেন।

মহাযজ্ঞ শেষে কর্ণের অভিলাষ পূর্ণ হল। নন্দন পর্বতে তিনি পিতার দর্শন লাভ করলেন। পুত্র গর্বে গর্বিত সূর্য সস্নেহে কর্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—তাঁকে অক্ষয় তূণ ও অজেয় ধনু দান করলেন। পিতৃস্নেহধন্য কর্ণ ফিরে চললেন অঙ্গ দেশে। এখানে এসে স্বর্গীয় শোভায় মুগ্ধ হলেন তাঁরা। অলকানন্দার তীরে কুটির তৈরি করে বাস করলেন কিছুকাল। তারপরে তপস্যায় বসতে চাইলেন। কিন্তু অবগাহন করবেন কেমন করে ? প্রয়াগ যে বহুদূর।

দেবী সুরেশ্বরী স্বর্গ থেকে শুনতে পেলেন সব। প্রিয়পাত্রের প্রয়োজনে পতিতপাবনী গঙ্গা স্বয়ং আবির্ভূতা হলেন কর্ণের কুটির প্রাঙ্গণে - মিলিত হলেন অলকানন্দার সঙ্গে। সঙ্গমে স্নান করে তৃপ্ত হলেন কর্ণ। তাঁর দেহ-মন পবিত্র হল। তিনি তপস্যায় বসলেন।

তপস্যা-তুষ্ট শিব দর্শন দিলেন তাঁকে। কর্ণের ধ্যানে ধন্য হল। এই প্রয়াগ—কর্ণপ্রয়াগ।

এখানে দেহরক্ষা করলে এক কল্পকাল শিবলোকবাসী হওয়া যায়।

কর্ণমন্দিরের পাশ দিয়ে নেমে গেলেই সঙ্গম। সঙ্গম বলতে আমরা যা বুঝি মোটেই তেমন নয়। সঙ্গমে কোন ঘাট নেই—এক ফালি মাঠ। মাঠের শেষে জল। শান্ত সমাহিত অলকানন্দা। জলে নামলেই হল। অলকানন্দার এ এক অন্যরূপ। তবে ঘোলা জল। বদ্রীনারায়ণের চরণামৃতে চর্চিত কিনা।

অলকানন্দা এসেছে উত্তর-পূর্ব থেকে। কর্ণগঙ্গা বা পিণ্ডরগঙ্গা

দক্ষিণ পূর্ব থেকে। মিলিত ধারা ধেয়ে চলেছে পশ্চিমে। সে ধারার নামও অলকানন্দা।

অলকাপুরী থেকে বদ্রীনারায়ণের চরণামৃত নিয়ে অলকানন্দা চলেছিল মর্তলোকে। অনেক বাধা অতিক্রম করে তাকে আসতে হয়েছে এখানে। পথশ্রমে কাতর হয়ে পড়েছিল সে। হারিয়ে ফেলে-ছিল চলার বেগ। দূর থেকে পিণ্ডারী তাকে দেখল—সর্বনাশ। অলকানন্দা মর্তে না পৌছলে তো মুক্তি পাবে না মর্তলোকবাসী।

পিণ্ডারী তার হৃৎপিণ্ড গলিয়ে সৃষ্টি করল এক স্ফটিকস্বচ্ছ বেগবতী জলধারা—পিণ্ডর-গঙ্গা। তাকে উৎসর্গ করল অলকানন্দায়। নতুন প্রাণসঞ্চারে উদ্বেলিত হল অলকানন্দা। উচ্ছল আবেগে সে ধেয়ে চলল পশ্চিমে—রুদ্রপ্রধান রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলিত হতে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সরু পায়ে চলা পথটি মিলিয়ে গেল আমার চোখের সামনে। আঁধার গ্রাস করলে কর্ণপ্রয়াগকে—আলোময় এই পৃথিবীকে। কোথাও আলো নেই। অনন্ত আঁধারের মাঝে বসে আছি একা এই কর্ণহীন পৃথিবীতে। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য একদিন যিনি জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে প্রলুব্ধ হন নি, আজন্ম মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হয়েও ধর্মের জন্য একদিন যিনি মাতার ব্যাকুল আহ্বানকে উপেক্ষা করেছিলেন, সেই সত্যাশ্রয়ী সর্বত্যাগী মহাপুরুষ আজ কোথায় ?

অলকানন্দা চলেছে কুরু-পাণ্ডবের দেশে—যেখানে মাটির জন্য ভাই ভাইয়ের বুকে আঘাত হানে। যুগ যুগ ধরে রক্ত পান করেও সে মাটির তৃষ্ণা মেটে নি, ক্ষুধা মেটে নি। আজও সে চিৎকার করে বলছে, 'ম্যায় ভুখা হুঁ,—এক কুরুক্ষেত্র থেকে আর এক কুরুক্ষেত্রে।

# নন্দরাজার নন্দপ্রয়াগ

ইতিহাস বলে—খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মগধে নন্দ নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। মহারাজ মহানন্দের ঔরসে এক শূদ্রার গর্ভে তাঁর জন্ম। তিনিই বিখ্যাত নন্দবংশের আদিপুরুষ। নন্দবংশের আটজন রাজা প্রায় এক শ বছর মগধে রাজত্ব করেন। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের যৌথ প্রচেষ্টায় নন্দবংশ ধ্বংস হয়।

পুরাণ বলে—পুরাকালে নন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। বহুযুগ ধরে রাজত্ব করে বৃদ্ধ বয়সে তিনি এখানে বাণপ্রস্থে আসেন এবং মহাদান দক্ষিণাযুক্ত এক মহাযজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞবেদীর ওপরে নির্মিত হয়েছে নন্দ-মন্দির। মন্দিরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম হয়েছে নন্দাকিনী। আর এই পুণ্যস্থানের নাম হয়েছে নন্দ-প্রয়াগ—নন্দাকিনী ও অলকানন্দার মিলনভূমি—নন্দরাজার নন্দপ্রয়াগ।

পাণ্ডারা বলে—এই প্রয়াগে স্নান করলে সর্বপাপমুক্ত হওয়া যায়।

কিন্তু পাপীরা কেউই আর আজকাল এখানে বড় একটা স্নান করেন না। বড় জোর নন্দাকিনীর পুলের ওপর বাস উঠলে তাঁরা হাত জোড় করে চোখ বুজে কার উদ্দেশ্যে যেন একবার প্রণাম করেন। উদ্দেশ্য না বোঝা গেলেও প্রণামটা সংক্রামক। সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাতখানাও গিয়ে ললাট স্পর্শ করবে।

আগে নন্দাকিনীর পুল না পেরিয়েই পাহাড়ের গায়ে বাস থামত।

পাহাড়টি খুব উঁচু নয়। খুব উঁচু পাহাড় নেই এখানে। নন্দপ্রয়াগের উচ্চতাও মোটে ৩০০০ ফুট। তা হলেও এ পাহাড়টা কিন্তু মারাত্মক। মাঝে মাঝে ছোট ছোট নানা রংয়ের পাথর টুপ টাপ করে নিচে পড়ে। ওর ছু-একখানা মাথায় পড়লে বদ্রীনাথ যাওয়া মাথায় উঠবে।

তাই এখন বাস স্ট্যাণ্ড সঙ্গমের কাছে সরিয়ে আনা হয়েছে। পুল পেরিয়ে নন্দাকিনীর তীর দিয়ে একটু এগিয়ে পথটি অলকানন্দার কাছে এসে ডাইনে বাঁক নিয়েছে। এই বাঁকের মুখেই নতুন বাসস্ট্যাণ্ড। শুধু বাস স্ট্যাণ্ড নয়, থানা ও বাজার। এখানে খানিকটা জায়গা সমতল। ছু দিকের বাস এসে থামে। নন্দপ্রয়াগও ঋষিকেশ-জোশীমঠ বাস-পথের একটি ঘাট। অবস্থান ৩০°১৯´৫৬" উত্তর ও ৭৯°২১´২৯" পূর্ব দ্রাঘিমা। এখান থেকে জোশীমঠ মাত্র ৩৬ মাইল। আমরা কর্ণপ্রয়াগ থেকে আরও ১২ মাইল এগিয়ে এসেছি।

ডান দিকে পাহাড়ের ওপর কিছু কিছু বাড়িঘর আছে, ছু-একখানা দোতালা বাড়িও দেখতে পাচ্ছি। বাঁ দিকে—নিচে মাঝে মাঝে ক্ষেত ও ঝোপ-ঝাড়। সঙ্গমের কাছে খানিকটা জায়গা বড় বড় গাছে ছাওয়া। গাছের ফাঁকে ফাঁকে মন্দিরের চূড়া ও ঘরের চাল দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বাঙালী সাধুর মন্দির। সকলেই দেবজ্ঞানে ভক্তি করেন এই সন্ন্যাসীকে।

বাস থেকে নেমে আমরা এগিয়ে চলি। দোকানের সংখ্যা নেহাত নগণ্য না হলেও বাজারটিকে ছোটই বলা উচিত। নন্দপ্রয়াগ জায়গাটাও বড় নয়। মুদি মনোহারী দর্জি বাসনপত্র সব রকমের দোকানই আছে। এখন যদিও যাত্রীরা কেউই কোন কেনাকাটা করেন না এখানে। সামান্য যে কজন যাত্রী কাঠগুদাম রেলস্টেশন থেকে থরালির বাসে চেপে ঘাটগ্রাম হয়ে হেঁটে এখানে আসেন, তাঁদের কাজে লাগে এই সব দোকান।

আগে যখন ঋষিকেশ-জোশীমঠ বাস-পথ ছিল না, তখন বহু যাত্রী

এই পথে ফিরে যেতেন। পথটি সহজ নয়—সংকীর্ণ চড়াই উতরাই। পথশ্রমে শ্রান্ত যাত্রীরা বিশ্রাম করতেন এখানে। কেনাকাটা করতেন, ঘুরে ঘুরে সব মন্দির দর্শন করতেন, প্রয়াগে স্নান করতেন। শাস্ত্র অনুযায়ী বদ্রীযাত্রীদের নন্দপ্রয়াগে এক রাত্রি বাস করতে হয় ও প্রয়াগে স্নান করতে হয়। স্কন্দপুরাণের মতে—নন্দাকিনী থেকে নন্দগিরি পর্যন্ত বদ্রীনাথ মণ্ডল। কিন্তু কোন্ পর্বতকে সেকালে নন্দগিরি বলা হত, তা আজ নিশ্চয় করে বলা কঠিন। আধুনিক মতে নন্দপ্রয়াগ থেকে শতোপন্থ হিমবাহ পর্যন্ত বদ্রীবিশাল ক্ষেত্র।

একটা চায়ের দোকানের সামনে এসে বসা গেল। আগে নন্দ-প্রয়াগে থানা ছিল না, কাজেই অশান্তিও ছিল না। কিন্তু তখনও চায়ের দোকান ছিল। চা নেশা হলেও শান্তিভঙ্গ করে না।

একটি জিনিস এখনও নেই এখানে—হাসপাতাল। তবে কি রোগ নেই নন্দপ্রয়াগে? আছে, কিন্তু খুব কম। যা আছে তার পক্ষে সরকারী আয়ুর্বেদিক ডিস্পেন্সারী যথেষ্ট। জায়গাটা ছোট হলেও মোটামুটি সবই আছে এখানে—চটি ধর্মশালা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাকবাংলো, ডাক-তার-টেলিফোন ঘর, জুনিয়ার হাইস্কুল ও কয়েকটি মন্দির—শ্রীশ্রীচণ্ডিকাদেবীর মন্দির, যশোদা গোপালজী কৃষ্ণ-বলরাম রমাপতি বশিষ্ঠেশ্বর মহাদেব লক্ষ্মীনারায়ণ ও নন্দরাজার মন্দির। বশিষ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি সব চেয়ে বড়। কিন্তু বদ্রীনাথ মন্দির সমিতি কেবল লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

কত কাল কেটে গেছে কিন্তু সংস্কার আছে বেঁচে। নারায়ণ সেবকরা আজও অনার্য নায়ক মহাদেবের মহাপূজায় মনোনিবেশ করতে পারছেন না। তাই বোধ করি কেদারনাথের জন্য আলাদা মন্দির সমিতি গঠন করতে হয়েছে সরকারকে।

এখানে একটি তক্ষক নাগের মন্দির আছে। তাই নন্দপ্রয়াগের অপর নাম তক্ষপ্রয়াগ।

ইদানীং নন্দপ্রয়াগের যে পরিমাণ গুরুত্ব বেড়েছে সে পরিমাণে

তার উন্নতি হয় নি। উন্নতির মধ্যে শুধু দেখছি ঝরণা থেকে নল দিয়ে জল এনে সারা জনপদে সরবরাহ করা হয়েছে।

যাক, স্থানীয় জনসাধারণ নলের জল পান করতে রাজী হয়েছেন তাহলে। কিছুকাল আগে শ্রীগণপৎ রায় খেমকা নামে একজন শ্রেষ্ঠী নন্দপ্রয়াগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে এখানে কয়েকদিন বাস করেছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের শ্রম লাঘবের জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে এইরকম নলের জলের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসীরা তাঁর সেই মহৎ অবদান গ্রহণ করতে পারেন নি। পাছে ঐ নলের জল পেটে গেলে জাত যায়, তাই তারা প্রভূত পরিশ্রম করে ঐ সব নল খুলে ফেলে অলকানন্দায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

বৃটিশ আমলে গাড়োয়াল ছিল দুভাগে বিভক্ত—বৃটিশ গাড়োয়াল ও টিহ্‌রী গাড়োয়াল। প্রথমটির রাজধানী ছিল পাউরী, দ্বিতীয়টির টিহ্‌রী। এই দুই জেলার উত্তর সীমান্তবর্তী অংশ নিয়ে দুটি নতুন জেলা সৃষ্টি করা হয়েছে—চামোলী ও উত্তরকাশী। এখান থেকে চামোলী মোটে সাত মাইল। জেলা-সদরের এত কাছে বলেই হয়তো নন্দপ্রয়াগ উপেক্ষিত। অথচ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এখনও দেবপ্রয়াগের পরেই নন্দপ্রয়াগের স্থান।

ক্রমে ক্রমে দোকানীর সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে লোকটি মোটামুটি লেখাপড়া জানেন। নন্দপ্রয়াগেরই স্থায়ী বাসিন্দা। বয়স বছর পঞ্চাশেক। আগে পাণ্ডাগিরি করতেন। আজকাল নন্দপ্রয়াগে পাণ্ডাদের ভাত নেই। তাই তিনি চায়ের দোকান করেছেন। ব্রাহ্মণ বৈশ্য হয়েছেন।

কথায় কথায় দোকানী তাঁর ফেলে আসা দিনের কথা বলছিলেন। তখন নন্দপ্রয়াগ ছিল জমজমাট। প্রায় শ পাঁচেক যাত্রীর বাসোপযোগী চটি ও দোকানপাট ছিল। শত শত যাত্রী প্রতিদিন আসতেন এখানে।

“আর কেনই বা আসবে না?” বলেই দোকানী চায়ের গ্লাসটা

এগিয়ে দেন আমার দিকে। গ্লাসটা হাতে নিতেই তিনি আবার শুরু করেন, "তখন প্রতি বছরে অন্ততঃ বিশজন শেঠ বৈকুণ্ঠে যেতেন।"

"বৈকুণ্ঠে !"

"হ্যাঁ, ভগবানের অক্ষয় নিকেতনে। বদ্রীনাথই তো বৈকুণ্ঠ।"

লজ্জা পেয়ে বলি, "যাই হক, সেই শেঠজীদের কথা বলুন।"

"তাঁরা প্রত্যেকে নিজ ব্যয়ে শতাধিক নিঃসম্বল যাত্রীকে বদ্রী-নারায়ণ দর্শন করাতেন। ওরা দল বেঁধে আসতেন এখানে। লক্ষ্মী বাঁধা ছিল আমাদের ঘরে।"

দোকানীর কথায় আমার মনে পড়ে যায় পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিক ই. টি এ্যাটকিনসন-এর কথা। তাঁর আমলে অর্থাৎ প্রায় পঁচাশি বছর আগেও নন্দপ্রয়াগ ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। মানা ও নিতি গিরিবর্ত্ম দিয়ে অসংখ্য তিব্বতী ভেড়ার পিঠে নুন আর সোহাগা নিয়ে প্রতি বছর এখানে আসত, বিনিময়ে নিয়ে যেত চাল ডাল আটা তামাক ও চিনি। শীতকালটা তারা কাটিয়ে যেত এখানে। তার মানে গ্রীষ্মকালে তীর্থযাত্রী সমাগমে গম গম করত আর শীতকালে তিব্বতীদের আগমনে জম-জমাট হয়ে থাকতো নন্দপ্রয়াগ।

দোকানী বলে চলেন—কখনও বা যজমানদের নিয়ে তাঁদের যেতে হত বৈরসকুণ্ডে। দুর্গম পথ। প্রথম দু মাইল নন্দাকিনীর পার দিয়ে। তার পর একটি ঝরণা পেরিয়ে চার মাইল চড়াই ভেঙে বৈরসকুণ্ড। কুণ্ডের সামনেই মহাদেবের মন্দির। দশানন মহাদেবের তপস্যা করে বর আদায় করেছিলেন সেখানে। শিব কিন্তু তালে মাতাল হলেও, আসলে ঠিক। দশ হাজার বছর তপস্যা করার পরেও তিনি রাবণকে অমর হবার বর দান করেন নি। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময়, রাবণের বিপদে অধীর হন নি। সেবকের বিপদে বিচলিত হন নি বলে, পার্বতী কোমর বেঁধে শিবের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছিলেন।

নারী হয়েও নারীহরণকারীর প্রতি করুণার অন্ত ছিল না পার্বতীর। দুর্জ্ঞেয় স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ !

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা দোকানীর হাতে ফিরিয়ে দিই। তিনি সেটি রেখে দিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, "আজকাল আপনারা তীর্থে এসেও শাস্ত্র মানেন না। তাই তো আমাদের এ দুর্গতি।"

চুপ করে থাকি। কথাটা সত্য হলেও অপরাধ যাত্রীদের নয়। অপরাধ যুগের—যে যুগ মানুষের সরল জীবনযাত্রাকে জটিল করে তুলেছে। আগে লোকের সময় ছিল, অর্থ ছিল। তীর্থে এসে তাঁদের ঘরে ফেরার তাড়া থাকত না। কেদার-বদ্রীর পথে প্রতি প্রয়াগে তাঁরা রাত কাটাতেন। স্থানীয় পাণ্ডারা প্রণামী পেতেন। আজকাল যাত্রীরা বাসে চেপে সোজা বদ্রীনাথ চলে যান। সেখানেও সবাই পাণ্ডা নেন না। তীর্থে এলেও অনেকেই তীর্থ করতে আসেন না। আমার মত ভবঘুরের সংখ্যা অল্প নয় এ পথে। ফলে পাণ্ডাদের জীবনধারণ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। তাঁরা বিকল্প বৃত্তি চাইছেন, কিন্তু সবার ভাগ্যে জুটছে না। দরিদ্র দেশ গাড়োয়াল দিন দিন দরিদ্রতর হচ্ছে।

চণ্ডিকামন্দিরের পাশ দিয়ে নিচে নেমে গেলেই সঙ্গম—শান্ত সঙ্গম। উদাস অলকানন্দার সঙ্গে উন্মনা নন্দাকিনীর সঙ্গম। দক্ষপুরী থেকে সতীকে নিয়ে শিব চলেছিলেন কৈলাসে। পথশ্রমে কাতর হয়ে পড়লেন সতী। তাঁর শরীর অবসন্ন হয়ে এল। শিব তাঁকে তুলে নিলেন কাঁধে। সতীর দু-চোখে নেমে এল তন্দ্রা। এইখানে এসে অলকানন্দার গর্জনে তাঁর তন্দ্রা গেল টুটে। মাথা তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'নাথ! আমার পিপাসা পেয়েছে।'

নন্দী ছিল ঠিক পেছনে। শিব কিছু বলার আগেই সে বলল, 'এ জল তো আপনি পান করতে পারবেন না দেবী। এ যে নর-নারায়ণের চরণামৃতে চর্চিত।'

'কিন্তু আমার যে গলা শুকিয়ে গেছে।'

নন্দী চুপ করে রইল।

শিব সহসা হাতের ত্রিশূল ছুঁড়ে মারলেন। ত্রিশূল বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে বজ্রগর্জনে মেদিনী গ্রথিত করল। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল থর থর করে কেঁপে উঠল। সৃষ্ট হল এক পর্বত, সৃষ্ট হল এক স্বচ্ছ শীতল সুমিষ্ট ধারা। বিশ্বনাথের সেই করুণা-বিগলিত ধারায় আকণ্ঠ তৃষ্ণা মিটিয়ে সুস্থ হলেন সতী। শিব ও শিবানী চললেন কৈলাসে।

শিবের ত্রিশূলাঘাতে সৃষ্ট ত্রিশূল পর্বত পিছনে পড়ে রইল। সতীর তৃষ্ণা মিটিয়েই তার কর্তব্য শেষ হয় নি। মর্তলোকের প্রয়োজনে অমৃতময়ী নন্দাকিনীর উৎস হয়ে সে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েকজন যাত্রী উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন। নামছেন সঙ্গমে— জলস্পর্শ করতে। নিখরচায় বাড়তি পুণ্য। ফাউ পেলে কে ছাড়ে!

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর বসতে সাহস হল না। ওপরের বাস এসে গেছে। এবার আমাদের বাস ছাড়বে। চায়ের দাম হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে দোকানী বলে, "তবু আপনারা এটুকু সময়ের জন্য বাস থেকে নামেন বলে আমরা বেঁচে আছি। ফেরার পথেও একবার পায়ের ধুলো দেবেন দয়া করে।"

ঘাড় নেড়ে বাসের দিকে হেঁটে চলি। দেকানী হয়তো ব্যবসার স্বাভাবিক নীতি অনুসারেই আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। তবু কেন যেন মায়া হচ্ছে তাঁর জন্য। এ কি এখানকার মাটির গুণ? যে মাটির বুকে দাঁড়িয়েই বনবাসী ঋষি একদিন উপলব্ধি করেছিলেন— 'স্নেহ অতি বিষম বস্তু!'

একদা এখানেই ছিল কুলপতি কশ্যপের পুণ্যাশ্রম। পলায়মানা চিত্রমৃগকে অনুসরণ করে চতুঃসিন্ধু-মেখলা-পৃথিবীর পতি দুষ্যন্ত এখানে এসেই জানতে পেরেছিলেন—তাঁর অস্ত্র বিপন্নকে ত্রাণ করার জন্য, নিরপরাধীকে প্রহার করার জন্য নয়। বুঝতে পেরেছিলেন— উদ্যানলতার চেয়ে বনলতা সুন্দর। দর্শন করেছিলেন—মূর্তিমতী

বাসনা প্রিয়তমা শকুন্তলাকে। এখানেই কোথাও ছিল সেই ছায়াশীতল সপ্তপর্ণবেদী, সেই কুরুবকতরু, সেই পদ্মগন্ধময় মালিনী নদী—যেখানে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার দৃষ্টি বিনিময়, মন বিনিময় ও প্রাণ বিনিময় হয়েছিল। ছিল সেই বেতসলতা-মণ্ডিতকুঞ্জ, যেখানে বসে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বলেছিলেন—

'অপরিক্ষত কোমলস্য যাবৎ কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপা তা ময়া তে সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য।'

'হায় রে, কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল!' সেই প্রস্ফুটিত কমলদলে পরিপূর্ণ, হরিদ্বর্ণে পরিশোভিত, শান্ত রসাস্পদ তপোবন আজ আর এখানে নেই। নেই সেই হরিণ-হরিণী, ময়ূর-ময়ূরী, মধুকর-মধুকরী। নেই শার্ঙ্গরব ও গৌতমী, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা। আছে শুধু তাঁদের স্মৃতি-বিজড়িত এই কণাসু—নন্দপ্রয়াগের সরকারী নাম—কণ্বাশ্রমের অপভ্রংশ।

এই প্রয়াগ আর তার এই পথ পরবর্তীকালে আবার একদিন ধন্য হয়েছে ধার্মিক রাজা নন্দের পদধূলিতে। প্রয়াগে স্নান করে মহারাজ নন্দ গিয়ে বসেছিলেন মহাযজ্ঞকুণ্ডের পাশে। বেদমন্ত্র শ্রবণ করেছিলেন পরম শ্রদ্ধা সহকারে। যজ্ঞানলে তাঁর শ্রীমুখ উদ্ভাসিত হয়েছিল। উদ্ভাসিত হয়েছিল এই পুণ্যতীর্থ। দল বেঁধে দেবতারা সেই যজ্ঞে যোগদান করেছিলেন। দূর দূর থেকে দরিদ্র-নারায়ণরা সমবেত হয়েছিলেন এই সঙ্গমে। যজ্ঞশেষে রাজা নন্দ করজোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের সামনে। দান করে ও দক্ষিণা দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন। ধন্য হয়েছিল এ প্রয়াগ—নন্দরাজার নন্দপ্রয়াগ।

# বিষ্ণুতীর্থ বিষ্ণুপ্রয়াগ

"রাস্তা ছোড়কে। হট্‌কে, হুঁশিয়ার।"

পেছনে ফিরে তাকাই। লাঠি নাচিয়ে একজন ভুটিয়া গলা ছেড়ে চিৎকার করছে। আমাকেই পথ ছেড়ে দিতে বলছে। না। কোন রাজাধিরাজ হাওদায় বসে হাতী চড়ে আসছেন না। এ পথে হাতী অচল। ভি. আই. পি-রা এ পথে আসেন বৈকি। তবে হাতীতে নয়, আসেন মানুষে চড়ে—ডাণ্ডি চেপে। কিন্তু এখন কোন ভি. আই. পি. আসছেন না—আসছে একপাল ভেড়া। এক দুই তিন, বিশ তিরিশ চল্লিশ—অগুন্‌তি। আসছে নেমে—সারা পথ জুড়ে, ধুলো উড়িয়ে। আসছে অব্যাহত গতিতে—পিঠে বোঝাই মাল নিয়ে, এই পাথুরে পথ দিয়ে। ভেড়ার পাল নয়, যেন বাঁধভাঙা জলের ঢেউ গড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে!

ওদের পথ দিতে হবে। সন্তর্পণে সরে দাঁড়ালাম পথের পাশে, নর্দমার ধারে।

ওরা চলে গেল হেলে দুলে—নবাবী চালে। যাচ্ছে নীতি গিরিদ্বারের দিকে। ভুটিয়ারা ওদের নিয়ে যাচ্ছে তাড়িয়ে। আমাদের তাড়াবার জন নেই। আমরা চলেছি মনের তাগিদে—জোশীমঠ থেকে বিষ্ণুপ্রয়াগে।

নন্দপ্রয়াগ থেকে কাল বিকেলে জোশীমঠ এসেছি। পাহাড়ীপথে বাস ভ্রমণ। আনন্দ থাকলেও আরাম নেই। ঝাঁকুনিতে সারা শরীর ব্যথা হয়ে যায়। অধিকাংশ যাত্রীরা আজ তাই থেকে গেলেন জোশীমঠে। জোশীমঠে থাকার কোন অসুবিধে নেই। কালিকমলীর ধর্মশালা, বহু চটি, বদ্রীনাথ মন্দির সমিতির তিনটি রেস্ট-হাউস ও একটি ক্যান্টিন

আছে। পি. ডব্.লু. ডি-র রেস্ট-হাউস আছে। জোশীমঠ পি. ডব্.লু. ডি-র দুটি ডিভিসানের এবং ন্যাশনাল এক্সটেন্সান সার্ভিসের পাইনখাণ্ডা ব্লকের হেড কোয়ার্টার। বদ্রীনাথ মন্দির সমিতিরও প্রধান কেন্দ্র জোশীমঠ। এখানেই তাঁদের বেদ-বেদাঙ্গ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়। তা ছাড়া রয়েছে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, পোস্ট-টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস, হার্বাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট আর অসংখ্য দোকান—প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া যায়। সামান্য ভাড়ার বিনিময়ে রাতের আশ্রয় মেলে অনেক দোকানে।

জোশীমঠ এ অঞ্চলের সব চেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ। অবস্থানই জোশীমঠকে সমৃদ্ধ করেছে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই জোশীমঠ ভারত তিব্বত বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। প্রাচীন কাল থেকে উত্তর গাড়োয়ালকে নিয়ন্ত্রিত করে, তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে জোশীমঠ।

তিব্বতে যাবার প্রধান দুটি পথ—নীতি ও মানা গিরিদ্বারের পথ এসে মিশেছে এখানে। এখান থেকে একটিমাত্র পথই নেমে গেছে মূল ভূখণ্ডের দিকে—ঋষিকেশের বাস-পথ। জোশীমঠ থেকে ঋষিকেশ ১৫৭ মাইল, নন্দপ্রয়াগ ৩৬ মাইল আর হাঁটা-পথে বদ্রীনাথ ১৯ মাইল। জোশীমঠ এখন চামোলী জেলার একটি মহকুমা। সীমান্তের কাছে বলেই জোশীমঠকে জেলা সদর করা হয় নি।

প্রাচীন যুগে জোশীমঠের নাম ছিল রবিগ্রাম। সে আমলের দু-একটি মন্দির এখনও কোনমতে টিকে আছে। এরই একটি মন্দিরে নিয়মিত নরবলি দেওয়া হত। শঙ্করাচার্য সেই পৈশাচিক অনুষ্ঠান রহিত করে রবিগ্রামকে ঘাতক-মুক্ত করেছিলেন।

এগারো বছর বয়সে শঙ্করাচার্য এখানে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন। একটি গুহায় পাঁচ বছর অতিবাহিত করেন। গুহাটি এখনও আছে। এই সময় তিনি ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও উপনিষদের ভাষ্যসহ ষোলখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সব গ্রন্থই তিনি নারায়ণকে উৎসর্গ করে গেছেন।

শঙ্করাচার্য প্রায় পঞ্চাশখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর প্রত্যেকখানি অমূল্য রত্ন বলে সমাদৃত। বত্রিশ বছরের জীবনে এ কেমন করে সম্ভব? কি বিস্ময়কর অলৌকিক প্রতিভা!

ষোল বছর বয়সে তিনি জ্যোতির্মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে জ্যোতির্মঠ থেকেই রবিগ্রামের নাম জোশীমঠ হয়েছে।

কাল সারা বিকেল আমরা ঘুরে ঘুরে জোশীমঠ দেখেছি। সবার শেষে গিয়েছিলাম জ্যোতির্মঠে। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি মঠের শ্রেষ্ঠতম। শহর থেকে প্রায় আধমাইল উঁচুতে অবস্থিত।

মঠের সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ফুল ও ফলের বাগান। প্রাকৃতিক পরিবেশ আপনা থেকেই মনকে ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে স্থাপন করে :

বারান্দাযুক্ত একখানি দোতালা বাড়ি। বেশ বড় বড় ঘর। দোতালায় মাঝের ঘরে শঙ্করাচার্যের গদি। কার্পেট মোড়া বেদীর ওপরে শঙ্করাচার্যের ছবি। অন্যান্য ঘরগুলি রাওয়ালজী ও সন্ন্যাসীদের জন্য নির্দিষ্ট। একজন বাঙালী সন্ন্যাসীও আছেন। তিনি বেদ-বেদাঙ্গ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

জ্যোতির্মঠে বসেই শঙ্করাচার্য কেদার-বদ্রীর মন্দিরকে হিন্দু মন্দির বলে ঘোষণা করেছিলেন। কেদার-বদ্রী বৌদ্ধপ্রভাব মুক্ত হল, অগণিত তীর্থযাত্রীকে নিয়ে এল এ-পথে। সেই থেকেই এই আসা যাওয়া চলেছে। চিরকাল চলবে। আসা যাওয়ার পথের ধারে জ্যোতির্মঠ আজও তেমনি রয়েছে দাঁড়িয়ে।

জ্যোতির্মঠ আছে, আছে সেই পথ, আছে বিষ্ণুপ্রয়াগ আর বদ্রীনাথ। শুধু নেই সেই মহামানব। আমরা তাঁর অমর আত্মাকে প্রণাম করেছি। বলেছি—অধর্ম আজ আবার গ্রাস করেছে তোমার সেই সনাতন ধর্মের প্রতি অণু-পরমাণুকে। উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোলে আজ তোমার এই সুন্দর শাশ্বত দেশের আকাশ বাতাস কলুষিত। তুমি এস, আবার আবির্ভূত হও। অধর্মের নাগপাশ থেকে আমাদের মুক্ত কর।

তিনি আসবেন। আসতেই হবে তাঁকে—'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

জোশীমঠ যেমন প্রাচীন যুগের বরণীয় তীর্থ, মধ্যযুগের প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার কীর্তিমন্দির, তেমনি বর্তমান যুগেও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ।

জোশীমঠ নিয়ে যুগে যুগে যুদ্ধ হয়েছে। তীব্বতীরা বহুবার এই পথে গাড়োয়াল আক্রমণ করেছে, কিন্তু কোনোবারই খুব সুবিধে করতে পারে নি। মনে পড়ছে তাদের সেই শেষ আক্রমণের কথা। সেবার যুদ্ধটা হয়েছিল নীতি গিরিদ্বারের কাছে। সে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত গাড়োয়ালীদেরই জয় হয়। আর সেই জয়ের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সেনাপতি লোধির। গাড়োয়ালের রাজা লঙ্গুরপট্টির লোধিকে সেনাপতি মনোনীত করেছিলেন।

বর্ষার শেষ। পথ বরফমুক্ত। তীব্বতীরা ভেবেছিল নীতি পেরিয়েই ঝড়ের বেগে এসে পৌঁছবে জোশীমঠে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। গিরিদ্বারের মুখেই লোধি তাদের বাধা দিলেন। কোন মতে ঠেকিয়ে রাখলেন কয়েক মাস। শীত এল। নীতির উচ্চতা ১৬৬২৮ ফুট। প্রচণ্ড শীত, রসদ নেই, পানীয় নেই। শীতের দাপটে গাছপালা মৃতপ্রায়। শুধু বেঁচে আছে মানুষের অখাদ্য ছঙ্গোলি—এক রকমের বুনো পাহাড়ী ঝোপ। দু পক্ষেরই সমান মুশকিল। চতুর লোধি অভিনব উপায়ে মুশকিল-আসান করলেন। কায়দা করে রটিয়ে দিলেন—মুনি-ঋষিদের খাদ্য এই ছঙ্গোলি শাক। অলৌকিক এর মহিমা। খেলেই অমরত্বলাভ ও শত্রুবিনাশ।

গাড়োয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছঙ্গোলির মহিমা ছড়িয়ে পড়ল। ছঙ্গোলি সহযোগে পোড়া রুটি গিলে বরফ চুষে গাড়োয়ালী সৈন্যরা নতুন উৎসাহে নিস্তেজ তিব্বতী আক্রমণকারীদের ওপর ভীমবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছঙ্গোলি লোধির গলায় বিজয়মাল্য দিল পরিয়ে।

চত্বর সেনাপতিকে মহারাজ'রিখোলা'বা রক্ষাকর্তা উপাধি দিলেন। বদলপুর পৈলোতে জায়গীর দিলেন।

শুধু বুদ্ধিমান নয়, অমিত বলশালী ছিলেন লোধি। একবার তিনি দশ মাইল দূর থেকে প্রকাণ্ড একখানা পাথর বয়ে এনেছিলেন। দশজন আধুনিক সেনাপতি মিলেও সেই পাথরখানা নড়াতে পারবেন না। সবাই বলে ছঙ্গোলিই লোধিকে অমিতবলশালী করেছিল। আমার এই উতরাইপথের দুধারেও ঝোপঝাড় দেখতে পাচ্ছি। এর মধ্যে হয়তো বা ছঙ্গোলিও রয়েছে। কিন্তু লাভ নেই কোন—আমি চিনি না। চিনলে চেষ্টা করে দেখতাম--বাঙালীর ভেতো নাম ঘোচানো যায় কিনা।

তিব্বতের সঙ্গে গাড়োয়ালের যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে বটে, কিন্তু সে যুদ্ধ ছিল রাজায় রাজায়। সে সব যুদ্ধে প্রজার প্রাণ গেছে, কিন্তু তাদের সেই যুদ্ধের প্রতি কোন সমর্থন ছিল না। সীমান্তের ভারতীয় ও তীব্বতীরা এতকাল কেউ কাউকে বিদেশী মনে করে নি। বংশানুক্রমে তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্য করে এসেছে। তাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনেও কোন বাধা ছিল না। ফলে দুই দেশের সীমান্ত এলাকা নিয়ে এক মিশ্র সমাজ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কোন ভারতীয় নাট্যকার এই সমাজ নিয়ে কোন নাটক মঞ্চস্থ করেন নি। করলে সে নাটকের মূল্য 'রাজকুমারী ওয়েন চেং'-য়ের চেয়ে কম হত না।

অষ্টম শতাব্দীতে তাং বংশের তাই সুং তখন চীনের সম্রাট। তিনি তিব্বতের রাজা শ্রোন্ সান্ গাম্পো-য়ের সঙ্গে তাঁর মেয়ে ওয়েন চেং-য়ের বিয়ে দেন। ইদানীং চৈনিক নাট্যকার তিয়েন হান এই বিবাহ-ঘটিত কাহিনী অবলম্বনে এক নাটক রচনা করে বাজিমাৎ করেছেন।

তিব্বত স্বাধীনতা হারাবার পর এই মিশ্র সমাজে ভাঙন ধরেছে। ভারত সীমান্তের ভুটিয়ারা প্রথম উপলব্ধি করছে—তারা তিব্বতী নয়,

তাদের তিব্বতে যাবার অধিকার নেই। এই যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় সীমান্তের অর্থনীতির ওপরে একটা প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। ভারতের পক্ষে এই চাপ-মুক্ত হওয়া হয়তো সম্ভব কিন্তু তিব্বতের পক্ষে নয়। অবস্থানই তিব্বতকে ভারতের মুখাপেক্ষী করেছে। বারো শ বছর আগের রাজায় রাজায় বিবাহ-ঘটিত কাহিনীর নজীর দিয়ে ভূগোলের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। রাজার ফরমায়েশে রাজকাহিনী রচিত হতে পারে কিন্তু রাজকাহিনী ইতিহাস নয়। ইতিহাস বলে—তিব্বত কোনকালে মূল চীনের অংশ ছিল না। তার একটা স্বতন্ত্র সত্তা ছিল চিরকাল।

যাক্‌গে এবারে জোশীমঠের কথায় ফিরে আসি। জোশীমঠ সুপ্রাচীন জনপদ। ১৮৭২ সালে ৪৫২ জন ও ১৮৮১ সালে ৫৭২ জন স্থায়ী অধিবাসী বাস করতেন। অবস্থানই জোশীমঠকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। ফলে হিমেল হাওয়া তেমন আসতে পারে না এখানে। জোশীমঠের অবস্থান ৭৯°৩৬´´ ২৪´´ পূঃ ও ৩০°৩৩´ ২৪´´ উঃ দ্রাঘিমাংশ।

ইতিমধ্যে আমরা জোশীমঠের বাজার ছাড়িয়ে এসেছি। বেশ সমৃদ্ধ বাজার। ছোটখাটো যে কোন মফঃস্বল শহরের মতই। বাজারের পথে নৃসিংহ মন্দির। মন্দিরের পাশ দিয়ে একটি পথ নেমে গেছে নিচে। এইটেই আমাদের পথ—বিষ্ণুতীর্থ বিষ্ণুপ্রয়াগের পথ। সোজা পথটি গেছে নীতি গিরিদ্বারের দিকে। যাকগে—এই দুর্নীতির যুগে নীতির দিকে ছুটে কি হবে?

জনবসতি শেষ হল। শুরু হল ক্ষেত। যে হারে জোশীমঠের লোকসংখ্যা বাড়ছে তাতে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এসব ক্ষেতখামার থাকবে না। পথটি সংকীর্ণতর হয়েছে। একটু বাদেই মোটর পথ পেরুতে হল। আবার বিষ্ণুপ্রয়াগের কাছে গিয়ে এ পথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। এখন বদ্রীনাথ পর্যন্ত বাস চলছে। আমরা বিষ্ণুপ্রয়াগ দর্শন করব বলে, বাসে না চেপে প্রাচীন পায়ে-চলা পথে বদ্রীনাথ চলেছি।

ক্ষেত শেষ হল। শুরু হল ঝোপঝাড়। উতরাই বাড়ছে, ধুলো বাড়ছে। ভুটিয়াদের ভেড়ার পাল এলে ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। দম আটকে আসছে। [illegible]াড়ের গা বেয়ে খানিকটা ওপরে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। ভেড়ার পাল বিদায় হলে আবার নেমে আসছি পথে।

সীমান্তের অধিকাংশ অধিবাসীরাই ভুটিয়া। দুর্গম পাহাড়ী পথে মালবহন ও পশুপালনই এদের প্রধান জীবিকা। ভেড়ার পাল নিয়ে দেশ-দেশান্তরে পাড়ি জমালেও এদের ঘর-বাড়ি আছে। সীমান্তের গ্রামগুলো এরাই গড়ে তুলেছে। শুধু গ্রাম নয়, সীমান্ত অঞ্চলের প্রায় সমস্ত পথের আবিষ্কারক এরা। এদের পায়ে-চলা পথরেখাকে অবলম্বন করেই হিমালয়ের অধিকাংশ রাস্তা তৈরি হয়েছে। দরিদ্র হলেও অত্যন্ত অতিথিবৎসল এরা। ভুটিয়াদের মত কষ্টসহিষ্ণু জাতি পৃথিবীতে খুবই কম আছে।

নেমে এসেছি অনেক। না, অধঃপতন হয় নি। তীর্থাভিলাষী তীর্থের নিকটতর হয়েছে। নিচে বিষ্ণুপ্রয়াগ। দুটি ধবলরেখা কৃষ্ণ-কালো প্রস্তরময় ভূখণ্ডের দুদিক থেকে এসে এক হয়ে গেছে। মিলনের উচ্ছ্বাস এখান থেকে উপলব্ধি করা যাচ্ছে না। তা হলেও জানি ওরা উচ্ছ্বসিত। শুধু ওরা নয়, নর এবং নারায়ণও উচ্ছ্বসিত—অলকানন্দার দুই তীরে দুটি পাহাড়। কৃষ্ণকালো কঠিন পাথরের দুটি খাড়াই পাহাড়। প্রাচীন নাম জয় ও বিজয়। এখন বদ্রীনাথের অনুকরণে স্থানীয়রা নাম দিয়েছেন নর ও নারায়ণ। তাঁরা বলেন—কলির শেষে নর ও নারায়ণ মিলে নরনারায়ণ হবে। অলকানন্দার ধারা হবে রুদ্ধ। তখন বিষ্ণুগঙ্গা বা ধবলগঙ্গাই হবে অলকানন্দা।

বিষ্ণুগঙ্গা এসেছে নীতি গিরিদ্বার থেকে। এখান থেকে আট মাইল দূরে, বিষ্ণুগঙ্গার তীরে শুভাইন নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানেও একটি নারায়ণের মন্দির আছে। এরা বলেন, ভবিষ্-বদ্রী—ভবিষ্যতের বদ্রীনাথ। সমতলের শিক্ষিত যাত্রীরা এই গল্পকে

স্থানীয় অশিক্ষিত লোকদের কল্পনা বলে উড়িয়ে দেন। অথচ এ কল্পনা আজ বাস্তবে পরিণত। অলকানন্দার ধারা রুদ্ধ না হলেও নর এবং নারায়ণ মিলিত হয়েছে—পুল তৈরি হয়ে গেছে, মোটর পথ প্রসারিত হয়েছে বদ্রী হয়ে ঘাসতলী।

বদ্রীযাত্রীদের এখন আর এ পথটুকুও হাঁটতে হয় না। ঋষিকেশে বাসে আরোহণ করে অবতরণ করেন বদ্রীনাথে। চীনেদের নেহাত দয়া না হলে বদ্রীবিশালের মন্দিরই অক্ষত থাকবে সন্দেহ নেই, কিন্তু এবারে বদ্রীবিশাল বোধ হয় বিদায় নেবেন বদ্রীনাথ থেকে।

ভক্তের জন্যই ভগবান। কিন্তু ভক্তের বড়ই অভাব এ জগতে। যাঁরা তীর্থে আসেন তাঁরা সবাই ভক্ত নন। প্রায় সকলেই আসেন পার্থিব প্রয়োজনে। পুজো দেবার আগে পূজারী প্রশ্ন করেন, 'মনস্কামনা কেয়া হ্যায় ?'

যে যাঁর আর্জি পেশ করেন। পূজারী প্রণামী পান।

স্বার্থান্বেষীর ভিড় কমাতে ভক্তের ভগবান তাই হিমালয়ের এই দুর্গম স্থানে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন—দুঃখ-কষ্টের ঊর্ধ্বে উঠে, ত্যাগের শাশ্বত মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে শুধু ভক্তরাই ছুটে আসবেন তাঁর পদপ্রান্তে। চেয়েছিলেন—দুর্গম পথ পরিক্রমায় তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে কাছে ডাকবে, সাহায্য করবে, ভালবাসবে। ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ—সব এক হয়ে যাবে।

যে পথ মানুষে মানুষে বিভেদ ভুলিয়েছে, সেই পায়ে-চলা দুর্গম পথ যদি যায় ফুরিয়ে, তবে বদ্রীবিশালও বিদায় নেবেন বদ্রীনাথ থেকে। অলকানন্দার ধারা রুদ্ধ না হলেও অলকাপুরী পরিণত হবে নারায়ণহীন নরপুরীতে।

সঙ্গম স্পষ্টতর হয়েছে। পূব থেকে আকাশী রংয়ের বিষ্ণুগঙ্গা এসে গৈরিক অলকানন্দার সঙ্গে মিশেছে। জোশীমঠ থেকে বিষ্ণুপ্রয়াগের দূরত্ব যাই হক ব্যবধান কিন্তু মাত্র সতেরো শ ফুটের

মত। জোশীমঠ পাহাড়ের ওপরে—উচ্চতা ৬২০০ ফুট। বিষ্ণুপ্রয়াগ পাহাড়ের পাদদেশে—উচ্চতা ৪৫০০ ফুট। সোজাসুজি নেমে আসার উপায় নেই, তাই আমাদের মাইল দুয়েক আঁকা-বাঁকা উতরাই ভাঙতে হয়েছে।

উতরাই শেষ হয়েছে পুলের মুখে—বিষ্ণুগঙ্গার তীরে। ১৩০ ফুট দীর্ঘ লোহা ও কাঠের মজবুত পুল। পুলের গোড়ায় রাস্তার দুধারে পাথরের রেলিং। আশেপাশে কিছু কিছু গাছপালা আছে।

পুল পেরিয়েই মন্দির। এখন বদ্রীনাথ মন্দির সমিতি এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ১৮৮৯ সালে ইন্দোরের মহারানী এই মন্দির ও সঙ্গমঘাট তৈরি করে দেন। তিনি নর্মদার তীর থেকে শিবলিঙ্গ এনে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এখন মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ নারায়ণ। এটি বিষ্ণুমন্দির বলেই বিখ্যাত।

"আপ্ মন্দির দর্শন করকে সঙ্গম যাইয়ে। হাম পাণ্ডুকেশ্বরমে ইন্তেজার করেঙ্গে।"

পেছন ফিরে দেখি আমার কুলি শ্রীমান মুচরা। প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সম্মতি জানাই। মুচরা এগিয়ে যায়। আমি নেমে এলাম মন্দিরের সামনে।

পাথরের আটকোণা মন্দির। ছোট মন্দির। তিন দিকে দরজা, সামনে বারান্দা। গম্বুজটি বিচিত্র—ইসলামী প্রভাবযুক্ত। মন্দির ছাড়াও খানকয়েক ঘর আছে মন্দিরের তিন দিকে। পাথরের ঘর, পাথরের মেঝে—পাথরের দেয়াল, পাথরের টালির চাল। এখানে সবই পাথর। কিন্তু এই পাথুরে দেশের মানুষগুলো মোটেই কঠিন নয়। বড়ই কোমল ওদের মন। পয়সা নেয়, কাজ করে। কিন্তু বিদায়-বেলায় চোখের জল ফেলে। পাথর ওদের প্রাণকে কঠিন করে তোলে নি, দারিদ্র্য ওদের মনের ঐশ্বর্য কেড়ে নিতে পারে নি। আশ্চর্য দেশ গাড়োয়াল।

মন্দিরের সামনের চত্বর পেরিয়ে অলকানন্দার দিকে যেতে ডান

দিকে কয়েকটি ছোট ছোট দোকান। তারপরেই অলকানন্দার গা ঘেঁষে এক সারি সিঁড়ি। দেড় শ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে তবে সঙ্গমের জল স্পর্শ করা যায়।

লোহার খুঁটি ও তার দিয়ে ঘাটের খানিকটা অংশ ঘিরে দেয়া হয়েছে। শেষের ধাপগুলোতে শেকল বাঁধা আছে। জলে নেমে স্নান করলেও যাতে কেউ ভেসে না যায়। জলের তোড় দেখে যদিও অনেকে জলে নামা তো দূরের কথা, পা পর্যন্ত ভেজাতে সাহস পান না। তাঁরা ঘাটে বসে ঘটি ভরে মাথায় জল ঢালেন—পুণ্যার্জন করেন।

সঙ্গমকে বলে বিষ্ণুকুণ্ড। ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্র নারদকে আদেশ করেছিলেন সৃষ্টির দায়িত্ব নিতে। নারদ ভাবলেন সৃষ্টির মত সৃষ্টিছাড়া কাজে মেতে থাকলে, বিষ্ণু-সাধনা ব্যাহত হবে। তাই তিনি ব্রহ্মার কথায় রাজী হলেন না। ব্রহ্মা গেলেন রেগে। শাপ দিলেন নারদকে। তাঁকে নিতে হল মানবজন্ম। মানুষ হয়েও কিন্তু নারদের বিষ্ণুভক্তি গেল না। বিষ্ণুর তপস্যা করতে তিনি এলেন এখানে। তন্ময়চিত্তে তপস্যারত রইলেন বহুকাল। তপোমুগ্ধ সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু ত্রিলোকের হিতার্থে ব্রহ্মজ্ঞান দান করলেন নারদকে। সেদিন থেকে দেবর্ষি নারদের এই সার্থক সাধনভূমি পরিণত হল পুণ্যপ্রয়াগে—বিষ্ণুতীর্থ বিষ্ণুপ্রয়াগে।

আরও নটি কুণ্ড আছে এ অঞ্চলে—ব্রহ্মা শিব গণেশ ভৃঙ্গী ঋষি সূর্য দুর্গা ধনদ ও প্রহ্লাদ কুণ্ড। শুনেছি সে সব কুণ্ডে যাওয়া খুবই কষ্টকর। যাঁরা কেবল পুণ্যার্জন করতেই এসেছেন এই পুণ্যতীর্থে, তাঁরা যান সেখানে। আমার মত পাপীর পাপ-স্খালনের পক্ষে এই বিষ্ণুকুণ্ডই যথেষ্ট।

বৈদিক যুগে বিষ্ণুপ্রয়াগ ছিল পবিত্র তীর্থ। পৌরাণিক যুগে বিষ্ণুপ্রয়াগ তার পবিত্রতা হারিয়েছিল, কারণ কেদারখণ্ডে তাকে প্রয়াগের মর্যাদা দেওয়া হয় নি। কেদারখণ্ডের পঞ্চপ্রয়াগ হল—বটপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়াগ। গঙ্গা-

যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম ত্রিবেণী তীর্থ শুধু অক্ষয়বটপ্রয়াগ নয়, সে পূর্ণকুম্ভ ধন্য পূর্ণ-প্রয়াগ। প্রয়াগ-প্রিয় পণ্ডিতজীর পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত তীর্থ—আপন মহিমায় মহিমান্বিত। উত্তরাখণ্ডের পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে তাকে না আনাই ভাল।

তাই এ যুগের মানুষ কেদার খণ্ড প্রণেতার মত মেনে নেন নি। তাঁরা বরণীয় বদ্রীনাথ পরিক্রমার পথে আমারই মত শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এসে দাঁড়িয়েছেন এখানে। সঙ্গমের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে গড়েছেন এই মন্দির আর এই ঘাট। বিষ্ণুগঙ্গা-অলকানন্দা সঙ্গম আবার প্রয়াগের মর্যাদা পেয়েছে।

সৌন্দর্যের বিচারে বিষ্ণুপ্রয়াগ হিমালয়ের রমণীয়তম সঙ্গম। দু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে নেমে এসেছে অলকানন্দা। উন্মত্ত আবেগে আলিঙ্গন করেছে উচ্ছল বিষ্ণুগঙ্গাকে—যেন বহুদিন বাদে যৌবনের মধ্যাহ্নে কৈশোরের সই-য়ের সঙ্গে দেখা। তাদের মিলনানন্দে আনন্দিত হয়ে উঠেছে বিষ্ণুপ্রয়াগ। সেই মিলনগীতি পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে সামগীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। সৃষ্টির জয়গানে বিশ্ব চরাচর মুখরিত করে রেখেছে।

এখানে এসে দাঁড়ালে মানুষের সকল মুখরতার অবসান হয়। শব্দময় সৈকতে দাঁড়িয়ে সে সামগীতি শ্রবণ করে, সফেন সঙ্গম দর্শন করে, স্বর্গবারি স্পর্শ করে—তার মর্ত জীবন ধন্য হয়।

অস্থির অলকানন্দাকে বুকে করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জয় ও বিজয়—নর ও নারায়ণ—ভক্ত ও ভগবান। ভগবান মিলিত হতে চাইছে ভক্তের সঙ্গে, ভক্ত আসতে চাইছে ভগবানের কাছে। কিন্তু বিরহের অলকানন্দা বইছে দুয়ের মাঝে। এ বিরহ শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত। এ বিরহের অবসানেই সৃষ্টির অবসান।

## বরণীয় বদ্রীনাথ

ঘুম ভেঙে যায়। কেউ গান গাইছে। গানের কথা বুঝতে পারছি না কিন্তু সুরটা ভাল লাগছে—করুণ সুর। স্লিপিং-ব্যাগের ভেতর থেকে মাথা বের করি। সবাই গভীর নিদ্রায় অচেতন। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। অসার নীরবতা। তারই মাঝে ভেসে আসছে ঐ করুণ সুর।

বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। অলকানন্দার ওপারে ঐ শ্যামল কোমল তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, চঞ্চলা লাস্যময়ী ঝরণা, ঐ অচঞ্চল অন্তহীন পাহাড়, অমল ধবল হিমরেখা, এই সংখ্যাতীত নক্ষত্র খচিত নির্মল আকাশ—এর মাঝে আমার স্থান কোথায়?

সবার ওপরে। এ তো আমরাই জগৎ। পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই অলকাপুরী। আমারই নির্দেশে প্রকৃতি একে এমনি করে সাজিয়ে রেখেছে। যারা একে অবিন্যস্ত ভাবে ভাবুক। এর কোন পরিবর্তন আমার মনে ধরবে না। অসীমের সঙ্গে আমার একাত্মবোধের অন্তরায় হবে।

মনে পড়ছে ঐ পাহাড়ের পরপারে আরেকটা জগৎ আছে। হিংসা দ্বেষ, ভয় ঈর্ষা, কাম ক্রোধ, লোভ মোহ দিয়ে ঘেরা সে জগৎ। সেখানে জীবন মানে সংগ্রাম। এ জগতে কোন সংগ্রাম নেই। শান্তি এখানে চিরস্থায়ী। আমি আমার এই অলকানন্দার ধারায় সে জগতের জীবনকে ক্লেদমুক্ত করার কত চেষ্টা করেছি—যুগ যুগান্ত ধরে। অসীম হিমবাহ থেকে সৃষ্ট হয়ে অসীম সাগরে বৃথাই নিজেকে বিলীন করে দিচ্ছে অলকানন্দা। পেছনে রেখে যাচ্ছে শুধু ব্যর্থতার ইতিহাস। এ ইতিহাস সে জগতের ইতিহাসে লেখা হয় নি। তবে

কোন কোন মানুষের মনে দাগ কেটেছে। তারা অলকানন্দার ব্যর্থতায় হতাশ হয় নি। উজান বেয়ে পাড়ি জমাতে চাইছে এ জগতের কূলে। ঘাটে ঘাটে তাঁদের ভিড় জমেছে। পতিতপাবনীর পুণ্য প্রবাহে সকল পাপ ও তাপ ধুয়ে ফেলে, চন্দনচর্চিত দেহে, এ জগতের পানে চেয়ে করজোড়ে তারা বলছে—

'হরি দিন তো গেল,
সন্ধ্যে হল—
পার কর আমারে।'

কিন্তু তাদের জীবনতরী এ জগতের তীরে ভিড়বে কি ?

আমার ভাবনার তরী তীরে ভেড়ে। বাস্তবে ফিরে আসি। গানের সুরে ঘুম ভেঙেছে। সুরের টানে বাইরে এসেছি। চলেছি যোগ-বদ্রীর দিকে। সেই সুর-যের উৎস অন্বেষণে।

ঐ তো বসে রয়েছে। এখানে এত রাতে যাত্রী ছাড়া আর কেই বা হবে ? এগিয়ে চলি।

কিন্তু মানুষই যে, তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে ? যদি অন্য কিছু হয় ?

ধ্যেৎ, তারা কি গান গায় ? গাইলেও তাদের ভারী বয়েই গেছে এখানে এসে আমাকে আকর্ষণ করার।

"এই কোন হ্যায় ?" আমার গলার স্বর ও পর্যন্ত পৌঁছেছে কি ?

হ্যাঁ। গান থেমে গেছে। গায়ক উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কথা বলছে না। থমকে দাঁড়াই। আমি ভয় পেয়েছি কি ? "কৌন হ্যায় ?"

"আমি ঈশী মহারাজ"। সে সেলাম করে।

"ঈশী ?" অস্থির পদক্ষেপে এগিয়ে আসি। হ্যাঁ, আমাদেরই একজন কুলি। খুব কম কথা বলে। সবার পেছনে চলে। আপন মনে থাকে। কখনও কোন প্রতিবাদ করে না। ওর এই শান্ত শিষ্ট নম্র নির্বিরোধ প্রকৃতির জন্য আমি ওকে লক্ষ্য করেছি প্রথম থেকেই

কিন্তু আলাপ করিনি। লক্ষ্য করেছি আরও একটি কারণে। আমাদের কুলিরা সকলেই গাড়োয়ালী। জোশীমঠের গাড়োয়ালীদের চেহারায় তিব্বতী ছাপটা বড় কম। কিন্তু ঈশীর চেহারা একটু স্বতন্ত্র। আমার তাকে তিব্বতী বলেই মনে হয়েছে। তাহলেও এ নিয়ে কোন আলোচনা করিনি।

"এ গান তুমি কোথায় শিখলে ?"

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ঈশী।

আমি একখানা পাথরে বসে পড়ি। এত শীতেও ঘেমে গেছি। স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমি একটু ভয়ই পেয়েছিলাম—আমি ভীরু।

ঈশী কথা বলছে না দেখে আবার বলি, "লজ্জা কি ? বল না কোথায় শিখেছ ? আমার খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু সুরটা এদেশী নয় কি না, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"গার্তকে।"

"গার্তক ? সে তো পশ্চিম তিব্বতের রাজধানী।"

"হ্যাঁ" ঈশী ক্ষাণ কণ্ঠে উত্তর দেয়।

"সেখানে ? তুমি কি ··।"

"হ্যাঁ, আমি তিব্বতী।" এবার স্পষ্ট স্বরে ঈশী বলে।

তাহলে আমার অনুমান মিথ্যে নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় জিজ্ঞাসা রয়েছে। বলি, "এত রাতে, এই শীতে ধর্মশালা ছেড়ে এখানে এসে গান গাইছিলে কেন ?"

"কর্মক্লান্ত দিনের শেষে, চাঁদের আলোয় স্নান সেরে, বিশ্ব যখন ঘুমের দেশে—সঙ্গীতের সেই তো সময়।"

ভাষা ও বক্তব্যে অবাক হই। কিন্তু সে ভাব গোপন রেখে বলি, "না। নিদ্রিত বিশ্বে সঙ্গীত অর্থহীন।"

"সঙ্গীত তো অর্থের মুখাপেক্ষী নয় মহারাজ। চাঁদের এই স্নিগ্ধ আলো আর এই শান্ত সুন্দর পরিবেশ কি আপনার মনে সঙ্গীতের

তৃষ্ণা এনে দেয় না ?”

“ঈশী।” চিৎকার করে উঠি।

“জী মহারাজ।” সে শান্ত স্বরে উত্তর দেয়।

“বল তুমি কে ?” আমি উত্তেজিত।

“আমি একজন কুলি।” ঈশী তেমনি শান্ত।

“মিথ্যে কথা। ঠিক করে বল।”

ঈশী নিরুত্তর।

অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে আমি আবার বলি, “ভয় নেই। তোমার কোন ক্ষতি করব না। সম্ভব হলে সাহায্য করব। বল, কেন তুমি আমাদের সঙ্গে এসেছ ?”

“টাকার জন্যে।”

“না। তোমার অন্য উদ্দেশ্য আছে।”

আবছা আলোয় ঠিক বোঝা গেল না। তবু মনে হল ঈশী এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে যেন একবার চম্‌কে উঠল। একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে ঈশী বলে, “উদ্দেশ্য দেশে ফেরা। তাই টাকার দরকার।”

“কিন্তু ক-টা টাকাই বা এতে তোমার হবে ?”

“যা হবে তাই জমাবো। অল্প অল্প করেই বেশি হবে। তারপর একদিন পালিয়ে সীমানা পেরিয়ে দেশে ফিরে যাব।”

আশ্চর্য আশা! দরিদ্র দেশ গাড়োয়াল। যাদের ক্ষেত-খামার আছে তাদের কোন রকমে অন্নের সংস্থান হয়। যাদের নেই, তারা মজুর খাটে, কাঠ কাটে, ভেড়া পালে, দোকান করে, মাল বয়। দিন আনে, দিন খায়। সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সে প্রসঙ্গ না তুলে বলি, “এসে আবার যেতে চাইছ কেন ?”

“এখানে আর মন টিকছে না। জানি না যাদের ছেড়ে এসেছি তাদের আর দেখতে পাব কিনা! তাহলেও ফিরে যেতে চাই। পালিয়ে দেশে ঢুকতে হবে।”

"চীনে সীমান্ত রক্ষীদের হাতে ধরা পড়লে ?"

"টাকা থাকলে নাকি কোন অসুবিধে হয় না।"

নামে আলাদা হলেও তিব্বত ছিল ভারতেরই অংশের মত। এক মুদ্রা, এক ডাক ব্যবস্থা—এমনকি অনেক জায়গায় ভারতীয় পুলিস চৌকি পর্যন্ত ছিল। সীমানা ছিল কিন্তু সীমান্ত-রক্ষী ছিল না। কৈলাস মানস-সরোবর ছিল ভারতীয়দের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। সারনাথ ও বুদ্ধ গয়া তিব্বতীদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তিব্বতীদের সহজাত। বর্তমান তিব্বতে সেটা সব চেয়ে বড় অপরাধ। আর এই অপরাধেই বোধ হয় ঈশী অপরাধী।

"ফিরে গিয়ে তোমার লাভ ?" আমি প্রশ্ন করি।

"বাঃ। তাদের নিয়ে আসব এখানে।"

ঈশীর উত্তর শুনে অবাক হই। প্রশ্ন করি, "কেমন করে ?"

"যেমন করে যাব।"

যে আশায় দিন গুনছে ঈশী, তাতে নিরাশার প্রলেপ বুলিয়ে লাভ কি ? বলি, "দেশে তোমার কে আছেন ?"

"আমার মা বাবা আর উমা।"

"সে কে ? তোমার স্ত্রী ?" প্রশ্নটা করে ফেলে একটু লজ্জা পাই। কিন্তু করেই যখন ফেলেছি তখন আর উপায় কি ? কাজেই চুপ করে থাকি।

একটু বাদে ঈশী উত্তর দেয়, "না। তবে···। সে কথা থাক। অনেক রাত হল। আর আপনাকে এই শীতের মধ্যে বসিয়ে রাখব না। চলুন এবার ধর্মশালায় ফেরা যাক।"

"আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ঈশী এক রকম ছুটতে ছুটতে ওদের ঘরে চলে গেল।

আর আমি···আমি জ্যোৎস্নাস্নাত নিঃসঙ্গ নিশুতি রাতে পাণ্ডুকেশ্বরের পথের ধারে নিঃশব্দে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ধীর পদক্ষেপে ঘরে ফিরলাম।

শুয়ে পড়লাম।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকলাম ঈশীর কথা।

ভাবতে ভাবতে একসময় আমার দু-চোখের পাতা এক হোল।

তন্দ্রা নেমে এল আমার দেহ ও মনে।

## ॥ দুই ॥

ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেছে। বেলা আটটা বাজে। কাল এমন সময় আমরা বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছে গেছি--জোশীমঠ থেকে রওনা হয়ে দু মাইল উৎরাই ভেঙেছি। আজ এখনও চা খাওয়া হল না। পূর্ণদা ও রতন চা তৈরি করছে। সমীর যথারীতি পূর্ণদার পেছনে লেগেছে। বলছে, "আপনি কেন রতনের পেছনে লেগেছেন? চায়ের বদলে পাচন পরিবেশন করলে, সবাই মিলে তো ওকেই ধমকাবে।"

গদাদা আবার হাঁক দিলেন, "গরম জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মুখ ধুয়ে নাও।"

অগত্যা আমি বেরিয়ে এলাম। মুখ ধুয়ে এসে উনোনের পাশে বসলাম। থ্রি কোর্স ব্রেকফাস্ট—চা শুকনো চিড়ে ও গুড়। বেশ ভালই লাগছে। রুচি পরিবর্তনশীল—স্থান কাল ও পাত্র বিশেষে।

বাঁধাছাঁদা প্রায় শেষ। যাত্রাকাল সমাগত। সূর্য অনেকটা ওপরে উঠেছে। কুয়াশা পালিয়ে গেছে দূরে—ঐ পাহাড়গুলোর কাছে, অলকানন্দার ওপারে।

প্রভাত রবির প্রথম পরশে ঝলমল করছে পাণ্ডুকেশ্বর। বিষ্ণু-প্রয়াগ থেকে ছ মাইল দূরে ছ-হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত একটি পাহাড়ী জনপদ। ডাকঘর থানা হাসপাতাল ডাকবাংলো জুনিয়ার হাইস্কুল—সবই আছে এখানে। এখন ওপর দিয়ে বাস রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। দুর্গম পথ সুগম হয়েছে। পদযাত্রার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিন্তু পদযাত্রা তো প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী নয়। নইলে

বাস থাকা সত্ত্বেও আমরা হাঁটছি কেন? বাস-পথ দিয়ে বাসে না এসে হেঁটে এখানে এসেছি কেন? অনেকেই আমাদের পাগল বলেছে। আমরা কোন প্রতিবাদ করিনি।

আমরা কেদারনাথ গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম আমরা পাঁচজন —পূর্ণদা গদাদা রঞ্জন সমীর ও আমি। গিয়েছিলাম পাথরের রাজ্যে পাথরের দেবতাকে দর্শন করতে। অক্ষয় অব্যয় পাথর। শিল্পীর বাটালি ক্ষয় করতে পারে নি সেই বিশাল গ্রানাইট শিলাকে। নিরাকার পরম ব্রহ্মের প্রতীক আকারহীন কেদারনাথ শিলা। মহিষরূপী মহেশ্বর। জগতের অগণিত ভক্ত এই আকারহীন পাথরকে প্রণতি জানিয়ে নিজেদের পাপমুক্ত করে চলেছেন।

আমরা বেরিয়ে এলাম পথে—পাণ্ডুকেশ্বরের পথে। জনবহুল না হলেও জনহীন নয়। পথচারীদের অধিকাংশই দরিদ্র যাত্রী—যাদের সঙ্গে বাসভাড়া নেই।

নভেম্বর মাস—যাত্রা শেষ। সবাই ফিরে চলেছেন ঘরে। শুধু আমরাই চলেছি বদ্রীনাথ? চলেছি মন্দির বন্ধের উৎসব দেখতে।

পঞ্চ-বদ্রীর অন্যতম এই পাণ্ডুকেশ্বর একটি পরম পবিত্র স্থান। উত্তরাখণ্ডে পঞ্চ-কেদারের মত পাঁচটি বদ্রীও আছে। বদ্রীনাথে বিশাল-বদ্রী, তপোবনে (শুভাইন) ভবিষ্য-বদ্রী, কুমার চটির কাছে সিলাং গ্রামে ধ্যান-বদ্রী, কর্ণপ্রয়াগ থেকে এগারো মাইল দূরে আদি-বদ্রী ও এই পাণ্ডুকেশ্বরে যোগ-বদ্রী।

মহারাজা পাণ্ডু একবার গ্রীষ্মকালে কুন্তী ও মাদ্রী সহ জোশীমঠে মৃগয়ায় এলেন। হত্যা করলেন মৃগরূপী এক মুনিকে। মুনিপত্নী অভিশাপ দিলেন রাজাকে—তুমি নিঃসন্তান হবে ......। রাজা তখন রাণীদের নিয়ে এলেন এখানে। তপস্যায় রত হলেন—বিষ্ণুর যোগ-বদ্রীরূপ ধ্যান করে শাপমুক্ত হলেন। জন্ম হল পঞ্চ পাণ্ডবের। পাণ্ডবদের জন্মভূমি এই পাণ্ডুকেশ্বর।

মহারাজা পাণ্ডু এখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন। মাদ্রীও তাঁর

সহমৃতা হয়েছিলেন।

মন্দির দুটিকে পেছনে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম বদ্রীনাথের দিকে। অতি প্রাচীন এই যোগ-বদ্রী ও বাসুদেবের মন্দির দুটি। অর্জুন নাকি স্বর্গ থেকে মূর্তি এনে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এই মন্দিরে। এই মন্দিরে চারটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। পাণ্ডারা বলেন এগুলো যুধিষ্ঠিরের লিপি—'পাণ্ডবোঁ কী পট'।

ঐতিহাসিকরা কিন্তু প্রমাণ করেছেন এগুলো কত্যুরী রাজাদের। নবম শতাব্দীতে এই অঞ্চলে কত্যুরী শাসন শুরু হয়। বৃটিশ আমলে ঐ চারটি তাম্রশাসনকে জোশীমঠে নিয়ে যাবার সময় পথে একটি হারিয়ে যায়। তিনটি এখনও জোশীমঠেই রক্ষিত আছে। গাড়োয়ালের মধ্যযুগের ইতিহাস এই তিনটি তাম্রশাসনকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।

প্রায় সমতল পথ। পথের দুধারে পাথরের বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট। আমরা শহর ছাড়িয়ে ঝরণা পেরিয়ে চলেছি এগিয়ে।

চলতে চলতে ঈশীকে লক্ষ্য করেছি। সেও বুঝতে পেরেছে। এড়িয়ে যেতে চাইছে আমাকে। কিন্তু আমিও নাছোরবান্দা। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমিও পেছিয়ে পড়ছি। এক সময় দেখলাম আমরা অনেক পেছনে পড়ে গেছি। এবারে শুরু করা যেতে পারে। বলি, "কাল রাতে বলনি উমা কে ? আজ কিন্তু না বললে শুনছি না।"

ঈশী চুপ করে থাকে। ওর একখানা হাত হাতে নিয়ে আবার বলি, "বলতে কোন বাধা আছে কি ?"

এইবারে মুখ খোলে ঈশী, "বাধা ? না বাধা কিসের ? তবে অযথা আপনার সময় নষ্ট হবে।"

"হোক গে। বাধা যখন নেই, তখন বল। আমি শুনব। আমি শুনতে চাইছি।"

ঈশী একবার আমার দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কি যেন একটু ভাবে। তারপরে করুণ-কণ্ঠে শুরু করে—"গার্তকের

এক জনবহুল মহল্লায় আমাদের বাড়ি। বাবার একমাত্র সন্তান আমি। ছোংরায় (বাজারে) হিন্দুস্থানী জিনিসপত্রের দোকান ছিল বাবার। জামা কাপড় বাসনপত্র ও মশলার দোকান। কাজেই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আমাদের। শুধু লেনদেন নয়, একটা আন্তরিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। প্রতি বছর গরমের সময় তাঁরা ভেড়ার পিঠে পণ্য চাপিয়ে গার্তক যেতেন। সঙ্গে থাকত একটি বড় ও একটি ছোট কালো তাঁবু। বাজারে তাঁবু ফেলে তাঁরা দোকান সাজিয়ে বসতেন। পুলিস ও পোস্ট অফিস নিয়ে হিন্দুস্থান থেকে ট্রেড এজেন্ট গার্তক পৌঁছতেন। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হত।

হিন্দুস্থানের সব ব্যাপারীরাই দোকান সাজিয়ে বসতেন না। অনেকে তিব্বতী মহাজনদের কাছে তাঁদের পণ্যদ্রব্য বেচে দিয়ে, দু-চারদিন জিরিয়ে নিয়ে দেশের দিকে পা বাড়াতেন। এদের বিশ্রামের জন্য বাড়িতে একখানা আলাদা ঘর ছিল আমাদের। সেখানেই তাঁরা থাকতেন। আমাদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করতেন। এমনি ভাবে অনেকে আমাদের প্রায় আত্মীয় হয়ে পড়েছিলেন। তবে নারায়ণ কাকার সঙ্গেই সম্পর্কটা হয়েছিল সব চেয়ে নিবিড়। বাবা তাঁকে নাম ধরে ডাকতেন। তিনি বাবাকে দাদা ও মাকে ভাবী বলতেন। কাকা শুধু বাবার ফরমাশ মত আমাদের মালই নিয়ে যেতেন। বাবাও যোগাড় করে রাখতেন কাকার ফরমাশী জিনিসপত্র। দিন দশ পনেরো তিনি থাকতেন আমাদের ওখানে। বিকেলে বাবা যখন দোকানের ঝমেলায় ব্যস্ত থাকতেন, মা থাকত রান্নাঘরে, আমি তখন চুপিচুপি এসে ঢুকতাম সেই অতিথিশালায়। কাকা হয়ত আধশোয়া হয়ে পুরনো বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি দেখতে পেতেন আমাকে। বইখানি রেখে উঠে বসতেন। ডাকতেন, 'আয় ওপরে উঠে আয়।'

বলামাত্র চৌকিতে উঠে তাঁর পাশে বসে পড়তাম আমি।

বলতাম, 'তারপর ?'

কাকা শুরু করতেন, 'আমেরিকায় তখন স্বাধীনতার যুদ্ধ চলেছে, ইংরেজরা বড়ই বিব্রত। কুমায়ূনেও দেখা দিল আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। সুযোগ বুঝে গাড়োয়ালের রাজা ললিতশাহ্ কুমায়ুন দখল করে নিলেন। মেজ ছেলে প্রত্যুম্ন শাহ্কে সেখানকার রাজা করে দিলেন।

'ললিত শাহের মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে জয়কীরথ শাহ্ গাড়োয়ালের সিংহাসনে বসলেন। তিনি প্রত্যুম্নকে তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে আদেশ করলেন। প্রত্যুম্ন রাজী হলেন না। বরং গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগর অধিকার করে নিজেকেই গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। ফলে ললিত শাহের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হল। তখনকার দিনে একজনের পক্ষে এই দুই রাজ্যকে পদানত করে রাখা সম্ভব ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই কুমায়ুন আবার স্বাধীন হয়ে গেল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিপদ কখনও একা আসে না। গাড়োয়ালের ঘোর দুর্দিন ঘনিয়ে এল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে শিখ ও গুর্জর আক্রমণ প্রতিহত করতে হল প্রত্যুম্ন শাহ্কে। তিন বছর বাদে, সামলে ওঠার আগেই আবার রোহিলা সর্দার জবিতা খান দুন উপত্যকা আক্রমণ করল। ধ্বংসের বন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে গেল দুন উপত্যকা।

এর পরে এল গুর্খারা। আগেই তারা কুমায়ূন দখল করে নিয়েছিল। কুমায়ুনের মন্ত্রী হরখদেবকে আশ্রয় দিলেন প্রত্যুম্ন শাহ্। গুর্খারা ক্ষেপে গিয়ে লাঙ্গুরগড়ের দুর্ভেদ্য পাহাড়ী দুর্গ অধিকার করল ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে। প্রত্যুম্ন শাহ্ ভয় পেয়ে সন্ধি করলেন। বছরে পঁচিশ হাজার টাকা কর দিতে রাজী হলেন।

১৮০৩ সালে প্রত্যুম্ন শাহ্ হরখদেবকে পাঠালেন লখ্নৌতে, অযোধ্যার নবাব আসফ্উদ্দৌলার কাছে—রোহিলা ও গুর্খাদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করতে। যে ভাবেই হক, কথাটা গুর্খাদের কানে গেল। হরখদের ফিরে আসার আগেই গুর্খারা গাড়োয়াল

দখল করে নিল। ভাগ্যহীন প্রত্যুম্ন শাহ্ পালিয়ে এলেন দেরাদুনে। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি।

রাজা হলেন পুত্র সুদর্শন শাহ্। তিনিও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। কারণ বিশ্বাসঘাতকতা করলেন আসফউদ্দৌলা। গুর্খারা তাঁকে তরাই অঞ্চল ঘুষ দিল। পরের বছরই দেরাদুনের যুদ্ধে সুদর্শন শাহ্ গুর্খাদের হাতে পরাজিত হলেন। নিরুপায় হয়ে সুদর্শন হরখদেবকে কাশীতে ইংরেজ রেসিডেণ্টের কাছে পাঠালেন। সেখান থেকে তিনি গেলেন লর্ড লেকের কাছে। তারপর শিখদের কাছে। ব্যর্থ হলেন সব জায়গায়। বারো বছর ধরে গুর্খারা গাড়োয়ালে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে গেল। হরিদ্বারে শুরু হল প্রকাশ্য দাস-ব্যবসা। তিন থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলে-মেয়েরা দশ থেকে দেড় শো টাকায় বিকোতে লাগল। হরখদেব তখন লুকিয়ে ছিলেন কন্‌খলে। তিনি দিল্লীতে ইংরেজ রেসিডেণ্টের কাছে চিঠি পাঠালেন-- মনুষ্যত্বের প্রয়োজনে এই ক্রীতদাস প্রথা রহিত করুন। সভ্যতার প্রয়োজনে এই গুর্খা অত্যাচার বন্ধ করুন।

সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে যারা পাশ্চাত্য প্রগতির ধ্বজা এনেছিল বহন করে, তারা হরখদেবের সেই আবেদন ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলেছিল। বারো বছরে দু লক্ষ মানুষ বিক্রি হয়ে গেল দেবভূমি হরিদ্বারে।'

এমনি ভাবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসত। মা ছেমে ( চর্বির প্রদীপ ) হাতে করে ঘরে ঢুকত, কাকা থামতেন।

মা আমাকে ধমক লাগাত, 'খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, না গল্প শুনলেই পেট ভরবে ?'

সে ছেমেটা রাখত মেঝেতে। তার পরে কাকাকে বলত, 'আপনি ওকে বড্ড বেশী লাই দিচ্ছেন। এসেছেন সেই গিয়াগার ( হিন্দুস্থান ) থেকে লাম ( পাকদণ্ডী ) ভেঙে, কত কাংরী ( বরফাবৃত পাহাড় )

গাংরী ( হিমবাহ ) ও গাদ ( ঝরণা ) পেরিয়ে। দুদিন জিরিয়ে নিয়ে আবার ফিরে যেতে হবে। কোথায় একটু শুয়ে ঘুমিয়ে শরীরটাকে ঠিক করে নেবেন। তা নয়, যত ছাই-ভস্মের গল্প ফেঁদে বসেছেন।'

আমি চুপ করে থাকতাম।

কাকা হেসে দিতেন। বলতেন, 'ঈশীকে গল্প বললে আমার শরীরটা তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায়। তুমি দেখে নিও ভাবী, ঈশী আমার বড় হয়ে পণ্ডিত হবে। তা ছাড়া ওর শ্বশুরবাড়ির দেশের গল্প, শুনবেই বা না কেন?'

'সে কী! কার সঙ্গে আবার আমার ছেলের বিয়ে ঠিক করলেন?

'আমার উমাকে আমি তোমার ঈশীর হাতেই তুলে দেব ভাবী! তোমরা আবার যেন আপত্তি কর না।'

মা উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ত।

ন বছরের ঈশী সেদিন এ সব কথায় কান দেয় নি। তার মন তখন বিষিয়ে গেছে গুর্খা ও ইংরেজদের ওপর। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে দাস ব্যবসা বন্ধ করতে হবে, শ্রীনগর উদ্ধার করতে হবে। তখনও সে জানত না তার পরের ইতিহাস। কিন্তু পরের দেশের জন্য কেন তার এই আকুলতা? বাঃ সে তো বিদেশে নয়—সে যে কাকার দেশ—উমার জন্মভূমি।

একটু থেমে ঈশী আবার আরম্ভ করে, "মা-মরা মেয়ে উমার কথা বলতে বলতে কাকার চোখদুটি জলে ভরে উঠত। আমার মা আছে। মা না থাকলে কি হয়, আমি জানি না। তবু কেন যেন আমারও চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে উঠত। কেমন একটা মায়া হত সেই অচেনা অদেখা মাতৃহীনা মেয়েটির জন্য। বলতাম—কাকা উমাকে এখানে নিয়ে আসুন। সে আমার মায়ের কাছে থাকবে।

সহসা সহজ হয়ে উঠতেন তিনি। বলতেন, 'আনব রে আনব। সময় হলেই নিয়ে আসব।'

নিয়ে আসার সময় কিন্তু এসেছিল তাঁর অনুমানের অনেক আগে। কথায় কথায় তিনি একদিন মাকে বলছিলেন নিজের অসুবিধের কথা। উমাকে দেখার কেউ থাকলে তিনি নিশ্চিন্তে কারবার করতে পারতেন।

মা বলল, 'তাকে নিয়ে আসুন না। সে থাকবে আমার কাছে। আপনি থাকবেন আপনার কারবার নিয়ে।'

'তাহলে আমার বাড়ি-ঘর দেখবে কে?'

'সাত বছরের তো মেয়ে। কত দেখছে আপনার বাড়ি-ঘর। বরং একপাল আত্মীয় পুষতে হচ্ছে তাকে দেখার জন্য। আপনার দাদাও বলেছেন, আমিও বলছি, আপনি হরশিলের বাড়ি তুলে দিয়ে এখানে চলে আসুন। দুজনে একসঙ্গে কারবার করুন।'

শেষ পর্যন্ত কাকা রাজী হলেন। রাজী হবার মূলে মার অনুরোধ, আমার আকুলতা আর বাবার আন্তরিকতা। বাবা বোঝালেন, বখরা নিয়ে ঝগড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই, কারণ···।" সহসা থেমে যায় ঈশী।

আমি বলে উঠি, "তুমি একমাত্র ছেলে আর কাকারও ঐ একটি মাত্র মেয়ে।"

ঈশী নীরব থাকে।

আমি আবার বলি, "তারপর?"

তবু নীরব থাকে ঈশী। হয়ত তার মানসপটে ভেসে উঠেছে তার কাকার ছবি অথবা—

একটু ভেবে নিয়ে ঈশী আবার শুরু করে—"অতিথিশালা ছেড়ে কাকা ভেতর-বাড়ির বাসিন্দা হলেন। বাবার সঙ্গে দোকানে গিয়ে বসলেন। বাড়ি ফিরেও বাবার সঙ্গেই তাঁর যত কথা। আমার গল্প শোনা বন্ধ হল। বাবার ওপর রাগ হল। অভিমান হল কাকার ওপরেও। সামনে গেলে তিনি আমাকে কাছে ডেকে নেন বটে কিন্তু কোলে বসিয়ে কেবল বাবার সঙ্গেই কথা বলতে থাকেন।

খানিকক্ষণ দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় আমি নিঃশব্দে মার কাছে চলে আসি। কাকা বোধ হয় টেরই পান না।

অবশেষে কাকা বিদায় নিলেন হাসিমুখে। আমরাও তাঁকে বিদায় দিলাম হাসিমুখে। আগামী গ্রীষ্মে তিনি আবার আসবেন —আসবেন হরশিলের সকল পাট চুকিয়ে—আসবেন উমাকে সঙ্গে নিয়ে।

আমাদের হাসি দেখে সেদিন কিন্তু অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আরও একজন নীরবে হেসেছিলেন। কিন্তু থাক্—সেই নিষ্ঠুর ভগবানের অবিচারের কথা বলে আপনাকে আমি তাঁর ওপর অবিশ্বাসী করে তুলব না আর তার সময়ও নেই। ঐ যে ওরা বসে রয়েছেন। সামনে হনুমান চটি দেখা যাচ্ছে।”

ঈশীর কাহিনী শোনায় তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম। এবারে সামনে তাকাই। দলের সবাই বসে আছে। মনে হচ্ছে আমাদেরই পথ চেয়ে। ভাগ্যিস সময় থাকতে ঈশীর খেয়াল হয়েছিল। নইলে একটু লজ্জাই পেতে হত। ঈশীর আসল পরিচয় এখনও ওদের কাছে প্রকাশ করিনি। তার সঙ্গে আমার এই ঘনিষ্ঠতা কুলিদের কাছে তো বটেই, সহযাত্রীদের চোখেও একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে। এর পরে যদি ওরা আমাদের আলাপের প্রসঙ্গ টের পায়, তবে আর ঈশীর পরিচয় গোপন রাখা যাবে না।

আমাদের দেখে ওরা উঠে দাঁড়ায়। আবার চলা শুরু করে।

·· সূর্য পেছনে ঢলে পড়তে শুরু করেছে। তাহলেও প্রখর রোদ। গরম লাগছে। কাছাকাছি কোথাও কোন ছায়া নেই। শুধু নিজেদের ছায়া সঙ্গে রয়েছে। নিজের ছায়া ছায়া দেয় না বরং ছায়াশীতল তরুতলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে তরু নেই, ছায়া নেই, তবে কি আছে? বিপদ আছে, কষ্ট আছে—আর? আর কি আছে? ··

“রুক্ যাইয়ে। সব রুক্ যাইয়ে।”

আর কিছু ভাবার সময় পাই না। রতন সিংয়ের চিৎকারে পেছন ফিরে তাকাই। পূর্ণদা পড়ে গেছেন। সমীর ও ধরম সিং তাঁকে ধরাধরি করে টেনে তুলছে। পথের এই অংশটুকু পাথরে বোঝাই —বিরাট বিরাট পাথর। সুগম পায়ে-চলা পথ দুর্গম হয়ে উঠেছে।

পূর্ণদা জ্ঞান হারান নি। তাঁকে বসিয়ে দেয়া হল একখানি পাথরে ঠেস দিয়ে। তিনি চোখ বুজে রইলেন। সমীর ওষুধপত্র বের করে ফেলে। ডান পায়ের হাঁটুটা একটু জখম হয়েছে।

প্রায় মিনিট পনেরো বাদে চোখ খুললেন পূর্ণদা। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "চল এবারে রওনা হওয়া যাক।" পাথরখানায় ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

আমি ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু গদাদা ইশারায় বারণ করলেন আমাকে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে পূর্ণদা খুবই ব্যথা পেয়েছেন।

সমীর জিজ্ঞেস করে, "পারবেন কি হাঁটতে ?"

"কেন পারব না ? তোমরা কি ভেবেছ আমাকে ? তোমরা এগিয়ে যাও। আমি মুচরার সঙ্গে আস্তে আস্তে আসছি।"

ধমক খেয়েও সমীর কিন্তু পূর্ণদার সঙ্গ ছাড়ল না। আমরা পা চালিয়ে চললাম।

আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা হনুমান চটিতে পৌছেছি। এখনও বেলা রয়েছে। আজই বদ্রীনাথ পৌছন যেত। কিন্তু পূর্ণদার কথা ভেবে আমরা আজ এখানেই রাত কাটাব স্থির করলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে ওরা এসে গেলেন। যাক পূর্ণদা হেঁটেই আসতে পেরেছেন কোনমতে। ধর্মশালায় ঢুকেই তিনি শুয়ে পড়লেন।

গদাদা রান্নার তদারক শুরু করছেন। সমীর বেরিয়ে গেল ক্যামেরা নিয়ে। আমি ও রঞ্জন বসলাম পূর্ণদার কাছে। তাঁর গা হাতপা টিপে দিচ্ছি আমরা। সহসা পূর্ণদা বলে ওঠেন, "মহারাজ, আমি পারব কি বদ্রীনাথ পৌছতে ?" তাঁর কণ্ঠে হতাশা।

"নিশ্চয়ই পারবেন।" আমি ভরসা দেই।

"আমার বোধ হয় বাসে যাওয়াই উচিত ছিল। মনে হচ্ছে—ভয় হচ্ছে, আমার জন্যই তোমাদের পদ-যাত্রা বিফল হবে।"

"ছিঃ ছিঃ। এ আপনি কি বলছেন? একটু আধটু আঘাত লাগতেই পারে। তাই বলে আপনি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন?"

পূর্ণদা তবু চুপ করে থাকেন। আমি আবার শুরু করি, "আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন যে আমরা প্রায় লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছি—এখান থেকে বাসে ওঠা নেহাৎই কাপুরুষের কাজ। বাসে ওঠা আর পেছিয়ে যাওয়া একই কথা। এখানেই যখন এসে পড়েছেন, মনের সব দ্বিধাকে ঘুচিয়ে শুধু একটি নামই বার বার জপ করুন—বদ্রীনাথ, বদ্রীনাথ।"

"বদ্রীনাথ।" পূর্ণদা অতিকষ্টে উচ্চারণ করেন।

"হ্যাঁ, বলুন জয়, বদ্রীবিশাল কি জয়।" রঞ্জনও শক্তি যোগায় তাঁকে।

চতুর্দিকের অগণিত পর্বতশৃঙ্গ ঢলে পড়া সূর্যের শেষ রশ্মিতে প্রজ্বল। পূর্ণদার মুখখানিও আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠে। মেঘমুক্ত ঐ নির্মল আকাশের মতই তাঁর মুখের সব মালিন্য গেল ঘুচে। হয়ত তাঁর মানসচক্ষে ভাস্বর হয়ে উঠেছে বিশ্বম্ভরম-বদ্রীনারায়ণের অনিন্দ্যসুন্দর অক্ষয় মূর্তি। বদ্রীবিশালের জয়গান তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে। নিজের দুখানি হাত কপালে ঠেকিয়ে তিনি আগের চেয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠেন, "জয়, বদ্রীবিশাল কি…।"

"জয়।"

## ॥ তিন ॥

রঞ্জনকে পূর্ণদার পাশে বসিয়ে আমি বেরিয়ে আসি পথে। সামনেই পুরনো ধর্মশালা। বর্তমানে উপেক্ষিত। নিচের তলা প্রায় ভেড়ার

গোয়ালে পরিণত। সংকীর্ণ পাথর বাঁধানো পথ। পথের দুধারে সারি সারি দোতালা বাড়ি। বাড়িগুলোর নিচের তলায় হয় পশুশালা, নয় দোকান। বেশীর ভাগই চা ও খাবারের দোকান। আগে গুটি ছয়েক মুদি আর মনোহারী দোকান ছিল। এখন একটি ছাড়া আর সব দোকানই বন্ধ। একে তো শীত এসে গেছে। তার ওপর এখন অবস্থাপন্ন যাত্রীরা সবাই বাসে বদ্রীনাথ চলে যান। তাঁরা কেউ থামেন না এখানে। তাই দোকানীরা নিচে পালিয়েছে।

দেবতাত্মা হিমালয়ের চার ধামের শেষ চড়াইয়ের আগে গড়ে উঠেছিল এমনি চারটি চটি। গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রীর আগে ভৈরব-ঘাটি ও খারশালী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথের আগে রামওয়ারা ও এই হনুমান চটি। এখান থেকে বদ্রীনাথ পাঁচ মাইল। প্রথম মাইল-খানেক প্রায় সমতল। তারপরেই প্রায় দু মাইল চড়াই, একেবারে 'দেও দেখানি' পর্যন্ত। তাই পদ-যাত্রীদের প্রয়োজনে এখানে গড়ে উঠেছিল এই ক্ষুদ্র জনপদ। এখন সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে। না, তাই বা বলি কেমন করে? সম্বলহীন যাত্রীর কাছে আজও হনুমান চটি অপরিহার্য।

জোশীমঠ থেকে এখানকার দূরত্ব চোদ্দ মাইল। জায়গাটা প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু।

দোকানের মধ্যে বসে চা খাচ্ছিল ঈশী। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। ওকে বসতে বলে ওর পাশে গিয়ে বসি। চা খেয়ে দুজনে দোকান থেকে বেরিয়ে আসি। জনবিরল পাহাড়ী পথ দিয়ে হাঁটতে থাকি উদ্দেশ্যহীন ভাবে। হাঁটতে হাঁটতে ঈশীকে বলি, "অন্তর্যামী অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে কেন হেসেছিলেন, সে কথা কিন্তু শোনা হয় নি।"

"শুনবেন?"

"নিশ্চয়ই।"

ঈশী শুরু করে, "কাকা ফিরে গেলেন দেশে। শীত এল তার দুঃসহ দুঃখ নিয়ে। মৃত্যুর শীতলতা নিয়ে দেখা দিল তিব্বত আর

গাড়োয়ালে। গাছের লতায় পাতায় কাঁপন ধরল। পাতা ঝরল। ঘাসের বন শিশিরে উঠল ভিজে। বন হল পুষ্পপত্রহীন। মৌমাছিরা গুঞ্জন বন্ধ করল। পাখীদের কূজন মিলিয়ে গেল। আর গার্তকে তখন আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে দিন গুনি।

এক সময় শীত শেষ হয়। আসে বসন্ত। কিন্তু তিব্বত আর গাড়োয়ালের বসন্ত আপনাদের দেশের মত নয়। বসন্তে এখানকার মালঞ্চে কোকিলের কুহুরব শোনা যায় না। শুধু বনের শাখায় শাখায় নতুন পাতার অঙ্কুর গজায়। বোঝা যায় শীত শেষ হয়েছে।

আমরা ঘরের বাইরে আসি। সবার সঙ্গে দেখা হয়। কুশল বিনিময় হয়। শীতে কার কি রকম কষ্ট হয়েছে জানা যায়। গাড়োয়াল থেকে কবে পর্যন্ত মালপত্র এসে পৌঁছবে তাই নিয়ে আলোচনা চলে। আমি কান পেতে শুনি আর ভাবি কাকার কথা—উমার কথা।

কাকা সাধারণতঃ প্রথম দিকেই এসে পৌঁছতেন। তখনও পথে বরফ থাকত।

আমরা বলতাম—আর কিছুদিন বাদে এলেই তো পারেন, বরফ একটু কমে গেলে। হাসতে হাসতে তিনি জবাব দিতেন—তখন যে জিনিসের দামও কমে যায়। তাছাড়া বরফ গলতে শুরু করলেই ধস নামে পথে। বরফে কষ্ট হয় পথ চলতে। কিন্তু প্রাণের ভয় থাকে না।

কাকা আসবেন। আসবেন উমাকে নিয়ে। আর দেরি নেই। খবর এসেছে হরশিলের প্রথম বণিকদল নেলাং গিরিদ্বার অতিক্রম করেছে। গার্তকের বাজার চঞ্চল—ব্যবসায়ীমহল উদ্‌গ্রীব। এবারে শুরু হবে সত্যিকার লেনদেন—কেনাকাটা।

চঞ্চল হয়েছি আমি। উদগ্রীব হয়েছে আমার মন। কাকা আসবেন—উমা আসবে। কতটুকু মেয়ে? কিরকম দেখতে? আমার কথা বুঝবে কি?

ঐ তারা আসছে। তারা এল। কোথায়? কাকাকে তো

দেখতে পাচ্ছি না। কাকা আসেন নি। উমা আসে নি। হয়ত উমাকে নিয়ে আসবেন বলে প্রথম দলের সঙ্গে কাকা আসতে পারেন নি। পরের দলে আসবেন।

না আসবেন না। কাকা আর কোনদিন আসবেন না গার্তকে।

কাকা নেই—জানালেন হরশিলের আরেকজন মহাজন। গত শীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়েছিল হরশিলে—প্রায় মহামারী রূপে। কাকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আমাদের কাছ থেকে—উমার কাছ থেকে।

উমা? সে কোথায়? কি ভাবে আছে? তার যে আর কেউ নেই। গার্তকে বসে কাকা প্রতিদিন বলতেন তার কথা। যেখানে তিনি গেছেন—সেখানে বসেও কি তিনি উমাকে মনে করছেন?

কিন্তু তাতে যে উমার কোন উপকারই হবে না। তিনি তার কোন সাহায্যই করতে পারবেন না।

কথাটা বাবারও মনে হল। তিনি চিঠি লিখলেন কাকার এক প্রতিবেশীর কাছে। টাকা পাঠিয়ে দিলেন। জানালেন কাকার শেষ ইচ্ছা।

যথাসময়ে উমা এল। নন্দনবনের একটি পারিজাত কুঁড়ির মত। কাকা ওকে তিব্বতী ভাষা শেখাচ্ছিলেন। তাছাড়া হরশিলের অধিবাসীরা তিব্বতী বুঝতে পারে। আমরা যেমন বুঝতে পারি গাড়োয়ালী। আমাদের মনের কথা গোপন রইল না।

মাকে সে মা বলে ডাকল, বাবাকে বাবা। আর আমাকে?

না, আমাকে দাদা বলল না। ডাকল নাম ধরে। আমি বয়সে বড় এটা মেনে নিয়েও কিছুতে স্বীকার করল না, দাদা হবার কোন যোগ্যতাই আমার আছে। ঠোট উল্‌টে ভুরু কুঁচকে কোনমতে জানাল আমাকে সে বড় জোর খেলার সাথী করে নিতে পারে।

মা তাকে মঠের পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। দুজনে এক

সঙ্গে যাই, এক সঙ্গে ফিরে আসি।

খেলা করি, খাই-দাই, পড়ি ও ঘুমাই। রঙীন পোশাক পরে হাত ধরাধরি করে 'চার্চাং-য়ে (ভাদ্রপূর্ণিমার মেলা) ঘুরে বেড়াই, ঘোড়দৌড়, তীর ধনুকের খেলা আর নাচ দেখি।

কেটে যায় দিন।

গত হয় মাস।

চলে যায় বছর।

বছরের পর বছর।

একদিন সহসা মনে হল আমি আর ছোট নই, বড় হয়ে গেছি। বাবাকে আমি দোকান-পাটের কাজে সাহায্য করি।

টের পেলাম উমাও বড় হয়ে গেছে। মাকে সে ঘর-সংসারের কাজে সাহায্য করে।

উমা আর আমার সঙ্গে ছুটোছুটি করে না। আমাদের ঝগড়া-ঝাঁটিও কমে গেছে। সে ধীরে ধীরে কেমন শান্ত হয়ে যাচ্ছে।

মঠের পাঠশালার পাট আমাদের চুকে গেছে অনেক আগেই। আমি মঠ ছেড়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু সে হয় নি। একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মা উমা আর স্কুলে পড়বে না?'

'না।'

'কেন?' আমি অবাক হই।

'ওকে তো আর দোকান করতে হবে না। যা করবে তাই শিখছে!'

'কি শিখছে মা?' বুঝতে পারি না।

'ঘরের কাজ।'

'এ আবার শিখতে হয় নাকি? ওতো সবাই পারে।' আমার হাসি পায়।

এতক্ষণ মার কোল ঘেঁষে চুপ করে বসে ছিল সে। এবার হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'তুই পারিস?'

'আলবাৎ।'

'বলতো...'

ওর সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি নি। কিন্তু সে সব কথা আজ থাক।

যথাসময়ে আমি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাস করলাম। মাস্টার মশাইরা পরামর্শ দিলেন লাসায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হতে। বাবা বললেন—কলেজে যদি পড়তেই হয় তবে উত্তরকাশীই ভাল। সবার মত বাবারও অগাধ আস্থা ছিল ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর। তাছাড়া দূরত্বের দিক থেকে উত্তরকাশী লাসার থেকে অনেক কাছে—যাতায়াতও সহজ। আর আমরা যে ভারতকে কোন দিনই বিদেশ ভাবি নি। বাবার বড় আশা ছিল আমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হব, এদেশেই কাজকর্ম জুটিয়ে নেব। তিনি গার্তক ছেড়ে হরশিলে স্থায়ী বাসা বাঁধবেন। কিন্তু Man Proposes God Disposes। না গড্ নয়, বিদেশী আক্রমণকারীরা বাবার সে আশা পূর্ণ হতে দেয় নি!"

"বিদেশী? কাদের বিদেশী বলছ?" আর চুপ করে থাকতে পারি না। ঈশীকে প্রশ্ন করে বসি।

"কেন? চীনারা। ওরা আবার তিব্বতী হল কবে থেকে?" ঈশী আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

"ওরা যে বলে তিব্বতীরাই চীনা।"

"ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। ইতিহাস বলে—সাম্রাজ্যবাদীরা চিরকালই মিথ্যেবাদী। হিটলার একই ভাবে সুদেতানল্যাণ্ড দখল করেছিল। ইতিহাস আরও বলে—হিটলারদের পতন অবশ্যম্ভাবী।" আবেগে ঈশীর বাক্‌রুদ্ধ হয়ে আসে।

আমি চুপ করে থাকি।

একটু সামলে নিয়ে সে আবার বলতে থাকে, "চীনাদের আমরা বলেছি—ইতিহাসকে অস্বীকার করে তোমাদের যুক্তি যদি আমরা মেনেও নিই তবু তো তোমরা এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পার

না। আমরা লামা শাসন থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম। কিন্তু বাঁচাতে চাই আউটার মঙ্গোলিয়ার মত। তোমরা নাকি সহ-অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাস কর—তবে আমাদের পায়ে পরাধানতার বেড়ি পরিয়ে দিচ্ছ কেন ?”

রাজনীতির চেয়ে ঈশার জীবনী আমার কাছে অনেক বেশী মূল্যবান। তাই ঈশীকে বাধা দিয়ে বলি, “এসব কথা পরে হবে। আগে বল তোমার বাবার আশা পূর্ণ হল না কেন ?”

“ঈশী সে কাহিনী বলুক আর তুমি প্রাণ ভরে তা শুনে মন দিয়ে বই লেখ—আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে আপততঃ ধর্মশালায় ফিরে চল। খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে।” রঞ্জনের কথায় আমার চমক ভাঙে। দেখি সে আমাদের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে। লজ্জা পেলাম।

## ॥ চার ॥

কুলিদের দেখলে কষ্ট হয়। খালি হাত-পায়েই আমাদের এ অবস্থা। ওদের পিঠে একমণ করে বোঝা। জামা ছেঁড়া, জুতো ছেঁড়া থামতে পারছে না। চলতে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে সমান তালে। কয়েকটা টাকার জন্যে কি অমানুষিক কষ্ট করতে হয় ওদের। তবু এরা ভাগ্যবান। যাই হক কিছু আয় করতে পারল এ বছর। প্রতি বছর প্রত্যেক কুলির যাত্রী মেলে না। প্রতীক্ষায় থাকাই সার হয়।

কিন্তু যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় তার তুলনায় এ-কটা টাকা কতটুকু।

হিমালয় তার সন্তানদের স্বাস্থ্য দিয়েছে সম্পদ দেয় নি, সাহস দিয়েছে সুযোগ দেয় নি, সততা দিয়েছে সম্ভ্রম দেয় নি।

আমরা হিমালয়ে আসি পাপের বোঝা কমাতে, এরা আমাদের বোঝা বয়।

আমরা গিরিতীর্থ দর্শন করে পর্বতপ্রমাণ পুণ্য সঞ্চয় করি, এরা নামমাত্র পারিশ্রমিক পায়।

তবু এরা প্রাণ দিয়ে আমাদের সাহায্য করে, সেবা করে, শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।

সেবাপরায়ণ স্নেহশীল এই মানুষগুলোর কিন্তু নিজেদের সমাজ আছে, সংস্কৃতি আছে, ধর্ম আছে। প্রতি বছর লক্ষাধিক তীর্থযাত্রী হিমালয়ে আসে, প্রতিপদে এদের সাহায্য নেয় অথচ এদের কথা কেউ বড় একটা ভাবে না। ভাবে না যে হিমালয় না হলে যেমন ভারতের ভৌগলিক রূপটি পূর্ণ হয় না, তেমনি এদের বাদ দিয়েও ভারতীয় সমাজ অপূর্ণ থেকে যায়।

হিমালয় শুধু পর্বত নয়, হিমালয় একটা বিষয়। হিমালয় আর তার মানুষদের নিয়ে অনেক গবেষণার অবকাশ রয়েছে। চূড়া বিজয় ভৌগলিক গবেষণায় সাহায্য করতে পারে, কিন্তু হিমালয়ের এই সরল ও স্নেহশীল অধিবাসীদের জীবন-বেদ রচনায় তার মূল্য খুব বেশী নয়।

আমাদের কুলির সংখ্যা চার—রতন সিং, বচনসিং, মুচরা ও ঈশী। ঈশী ওদের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ। তাহলেও ঈশীকে ওরা সম্মান করে। সে যে লেখাপড়া জানে।

সকাল আটটায় হনুমান চটি থেকে রওনা হয়ে আমরা মাইল তিনেক এগিয়েছি। দুবার অলকানন্দা পেরিয়ে আবার নদীর বাঁ তীরে এসেছি। এ জায়গাটার নাম রড়ং—ছোট একটি গ্রাম।

গ্রাম ছাড়িয়েই চড়াই শুরু। বদ্রীনাথ পথের একমাত্র উল্লেখযোগ্য চড়াই। একটু লড়াই করেই এ চড়াই পেরুতে হয়। তাই ওরা শক্তি সংগ্রহের জন্য একটা চায়ের দোকানের সামনে বসে পড়লেন।

আমি কিন্তু চড়াই ভাঙতে শুরু করলাম। যতটা পারা যায় এগিয়ে নেয়া যাক। ঈশীও আমার সঙ্গ নিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। আমরা অনেকটা উঠে এসেছি।

এবারে থামতে হল। টুং টাং শব্দ করে একটি ভুটিয়া কুকুরের নেতৃত্বে একপাল ভেড়া ওপর থেকে নেমে আসছে। আমরা পথের পাশে একখানি পাথরের উপর উঠে দাঁড়ালাম। শহরে যেমন 'লেডিজ-ফার্স্ট,' পাহাড়ে তেমনি 'শীপ-ফার্স্ট'। প্রথমটি লিখিত নিয়ম, দ্বিতীয়টি অলিখিত রীতি। ছুটোই আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা।

আমি হাঁফাচ্ছি দেখে ঈশী বলে, "দূরবীন ও মুভি ক্যামেরাটা আমাকে দিন না।"

নিলে ভালই হয়। ছুটোই বেশ ভারী। তবু বলি, "না না ঠিক আছে। তোমার কষ্ট হবে।"

কিন্তু ঈশী নাছোরবান্দা সে একরকম জোর করেই আমার ক্যামেরা ও দূরবীনের বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে, অক্লেশে এগিয়ে চলে। দরদী বলেই বোধ হয় ঈশীর এত ছুঃখ। কিন্তু মানুষের ভগবান তো মানুষকে শুধু ছুঃখের ছুঃসহ ভারই কাঁধে তুলে দেন না। তিনি যে ছুঃখহারী। ঈশীর সব ছুঃখ তিনি ঘোচাবেন। এই মহৎ প্রাণের সব ব্যথার একদিন অবসান হবে। ঈশীর সেই অনাগত সুখের দিনকে স্বাগত জানাই।

চড়াই শেষ হয় নি কিন্তু তার সবচেয়ে কষ্টকর অংশটুকু শেষ হল। আমরা কাঞ্চন-গঙ্গা পেরিয়ে এলাম। সহযাত্রীদের দেখতে পাচ্ছি না। ওরা নিশ্চয়ই অনেক পেছনে পড়ে গেছে। এইবারে কিছুক্ষণ বসা যাক। ছু-জনে একখানা পাথরের ওপর বসে পড়ি। একটু জিরিয়ে নিয়ে তারপর ঈশীকে বলি, "কাল কিন্তু তোমার সব কথা শোনা হয় নি।"

ঈশী নির্বাক। সে অপলক নয়নে তাকিয়ে আছে ফেলে আসা পথের পানে। ফেলে আসা জীবনের কথা ভাবছে কি ?

আমি চুপ করে থাকি।

একটু বাদে চোখ ফেরায় ঈশী। বলে, "কি হবে সে ছুঃখের কথা শুনে ?"

"আমি তোমার দুঃখের অংশীদার হব।"

ঈশী তবু চুপ করে থাকে।

আমি আবার বলি, "তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন ঈশী? আবার তুমি দেশে যাবে। দেখা হবে মা বাবা আর উমার সঙ্গে।"

"সেই আশাতেই তো বেঁচে আছি মহারাজ! কিন্তু ভয় হয়..."

"ভয় কিসের? এ অবস্থা কি চিরকাল চলবে নাকি? আবার অবাধ যাতায়াত শুরু হবে গাড়োয়াল ও তিব্বতের মধ্যে। উপরন্তু চীনের নতুন শাসকদের সুশাসনে হুকু অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবে তোমরা।"

"আমরাও তাই ভাবছিলাম মহারাজ! কিন্তু.."

"থামলে কেন? বল।" আমি ধৈর্য হারাই।

"আমরাও তাই চীনাদের বরণ করেছিলাম। ভেবেছিলাম লামা অত্যাচারের অবসান হবে। কিন্তু ভুল মহারাজ, ভুল। আমাদের খেয়াল ছিল না যে বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুরও অনেক ভাল। তা ছাড়া এক বিচিত্র সম্রাজ্য লিপ্সায় অন্ধ হয়ে চীন তিব্বত দখল করেছে। কবে কোন সুদূর অতীতে কোন দেশের কোন রাজা চীনের সম্রাটকে কর দিয়েছিলেন, তারই নজীর দেখিয়ে চীনের বর্তমান শাসক-গোষ্ঠী অধেক পৃথিবীর অধীশ্বর হতে চাইছে।"

"আমি কিন্তু ইতিহাস শুনতে চাইনি ঈশী, শুনতে চাই তোমার কথা। 'তোমার বাবা বললেন—তোমাকে উত্তরকাশী যেতে হবে পড়শুনা করতে। তারপর?"

"বাবার কথা শুনে খুবই আনন্দ হল। গাড়োয়ালে যাব। ছোটবেলায় কাকার কাছে কত গল্প শুনেছি—আমার শৈববের কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবে। দোকান থেকে এক দৌড়ে বাড়ি এলাম। মা ছিল রান্নাঘরে। উমাও ছিল সেখানে। মাকু ঘুরিয়ে উল কাটছিল। কথাটা শুনে দুজনেই কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ল।

তবু আমি মাকে তাগিদ দিই—বল না মা কবে যাব ?

বিরক্ত কণ্ঠে মা জবাব দিল—'জানিনা বাপু তোমার বাবা তোমাকে কতবড় দিগ্‌গজ করতে চায়। আমাদের চৌদ্দ পুরুষে তো কেউ পড়াশুনা করতে গাড়োয়ালে যায় নি! আর পড়াশুনো করেই বা কি হবে? করতে তো হবে সেই দোকানদারী।'

মার কথায় মুষড়ে পড়লাম। কাকা বলতেন, আমি লেখাপড়া শিখব, মানুষ হব। আর মা বলছে, আমাকে দোকানদারী করতে হবে। দোকানদারী করে যে মানুষ হওয়া যায় তা তখনও জানা ছিল না। জানা ছিল না যে এযুগে সারা পৃথিবীটাই একটা বাজারে পরিণত হয়েছে। শক্তিশালীরা দোকান সাজিয়ে বসেছে, দুর্বলদের নিয়ে ফাটকা খেলছে।

যাই হোক আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মা কাজ করে যাচ্ছে। একটু বাদে মুখ তুলল উমা। আমার দিকে একবার তাকিয়ে সে মাকে বলে, 'বাবার যখন ইচ্ছে, তখন ওকে আমাদের যেতে দেওয়াই উচিত হবে মা।'

মা বলে—'তা তো বটেই। সে যখন একবার মুখ থেকে বের করেছে, তখন কার সাধ্যি বাধা দেয়। কিন্তু আর লেখাপড়া শিখে কি লাভ হবে?'

উমা জবাব দিয়েছিল, 'লাভ নেই? কি বলছ? সবাই ওকে ভাল বাসবে, সম্মান করবে। সে কি তুমি চাওনা মা?'

আরও অনেক কথা সেদিন বলেছিল উমা। শুধু মা নয়, আমিও অবাক হয়েছিলাম তার কথা শুনে। কতই বা বয়স, কিন্তু কি চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে।

একটু বাদে মা হেসে বলে, 'না চাইলেই বা শুনছে কে? তোর বাবার দলের লোকের তো অভাব নেই। কি বলিস ঈশী!'

উমা অভিমানে ফুলে উঠেছিল, 'আমি বুঝি শুধু বাবার, তোমাদের কেউ নই?'

মা তাড়াতাড়ি উমাকে কাছে টেনে নিয়েছে। কোন আপত্তি করে নি সে। মার বুকে মুখ লুকিয়ে চুপ করে বসে থেকেছে আর পিট পিট করে আমার দিকে তাকিয়েছে।

কয়েকদিন বাদে বাবা একদিন দোকান থেকে এসে জানালেন, পরদিন সকালেই তাঁর জানাশোনা একদল গাড়োয়ালী বণিক হরশিল রওনা হচ্ছেন। ভাল সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের কথা, কাজেই এ সুযোগ নষ্ট করা উচিত হবে না।

উমা আমার সব জিনিস পত্র গুছিয়ে দিল। চলে যাব বলে সেদিন রাতে আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। বাবা চিরদিন স্বল্পভাষী, তার ওপর খাবার সময় একেবারেই কথা বলেন না। কিন্তু সেদিন তিনি সারাক্ষণ ধরে কথা বললেন আমার সঙ্গে। মা এবং উমাও সুযোগ মত নানা পরামর্শ দিল আমাকে।

তারপরে এক সময়ে খওয়া-দাওয়ার পাট চুকল। মা ও বাবা চলে গেলেন বড় ঘরে। উমা বাসন-পত্র ধোয়া মোছায় লেগে গেল। আমি চলে এলাম সামনের ঘরে। শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকলাম নানা কথা—অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা, মা বাবা ও উমার কথা—আমার কথা।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠে বসি। জিজ্ঞেস করি—'কে ?'

'চুপ।'

সে কী ? এত রাতে!

আস্তে আস্তে দরজা খুলি।

ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয় উমা।

ফিস ফিস করে বলি, 'এত রাতে এভাবে এঘরে এলে!'

কোন উত্তর দেয় না সে।

আমি আবার বলি, 'এত সাহস কোথায় পেলে ?'

আর সামলাতে পারে না সে। একেবারে ভেঙে পড়ে। ওর চোখের জলে আমার বুক ভেসে যায়। আমারও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। চুপ করে থাকি।

কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়। তারপর নিজের ঝাপসা চোখ দুটো মুছে নিয়ে ওর মাথায় সস্নেহে পরশ বুলিয়ে বলি, 'তোমার বাবার কত আশা ছিল—আমি লেখাপড়া শিখব, বড় হব। তাঁর সে আশা পূর্ণ না হলে যে তিনি স্বর্গে বসেও শান্তি পাবেন না উমা। আমি বড় হব। সবাই তোমাকে ঈর্ষা করবে…'

মুখ তোলে সে। কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলে, 'একা আমার দিন কাটবে কেমন করে ?'

'তিনটে তো বছর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

উমা আবার চুপ করে থাকে। রাত্রি প্রহর থেকে প্রহরে গড়িয়ে চলে। নিষ্ঠুর রাত। কত নারীর এমনি কত আকুল ক্রন্দনকে আত্মসাৎ করে আজও সে নির্বিকার রয়েছে।

এক সময় স্বাভাবিক হয় উমা। বলে, 'বহুদিনই তুমি ঘরছাড়া। স্কুল ছুটি হলে বাড়ি এসেছ, আবার চলে গেছ। বিদায় বেলায় ব্যথা পেয়েছি। বুকভরা সেই বেদনা নিয়ে তোমার ফিরে আসার দিন গুণেছি। কিন্তু এবার…আরও দূরে চলে যাচ্ছ তুমি। আমার বড্ড ভয় করছে।'

'পাগল মেয়ে। ভয় কিসের ?'

'আর যদি আমাদের দেখা না হয় ?'

'কি সব যা তা বলছ ? দেখা হবে না কেন ?'

'সীমান্তে চীনারা সৈন্য সমাবেশ করছে। তারা নাকি তিব্বত দখল করে নেবে। এদিকে ভারতীয় সৈন্যরাও তো ডাকঘর গুটিয়ে চলে গেছে গার্তক থেকে। মহামান্য দালাই লামা আমাদের গারপনকে* ডেকে পাঠিয়েছেন লাসায়। কিন্তু কি লাভ হবে

* পশ্চিম তিব্বতের মুখ্য শাসক

তাতে ? কে রক্ষা করবে আমাদের ?'

'ও তাই তোমার ভয় ?' আমি কথাটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি।

কিন্তু তাতে উমার ভয় কাটে না। সে বলে 'শুনেছি চীনারা বড় নৃশংস। ওরা নাকি সব খায়।'

'তাই বলে কি তোমাকে খেয়ে ফেলবে নাকি ?' আমি আবহাওয়াটাকে হালকা করে তুলতে চাই।

'না তা নয়। তবে ওরা যদি গাড়োয়ালের রাস্তা বন্ধ করে দেয়, তোমাকে আর ফিরতে না দেয় এখানে ?'

ইচ্ছে হয়েছিল খুব একচোট হেসে উমার ভয় ভাঙাই কিন্তু হাসতে পারি না, পাছে বাবা মার ঘুম ভেঙে যায়। তাই তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে হাসিমুখে বলি, 'চীনারা সাম্যবাদী। তারা কি সাম্রাজ্যবাদী হতে পারে ? বড় জোর আমাদের লামা অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করে আবার দেশে ফিরে যাবে। তারা কেন আমাকে আসতে দেবে না গাড়োয়াল থেকে ? তাছাড়া হিন্দুস্থানের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক অতি আপন—হিন্দি চীনী ভাই ভাই।'

আমার কথায় আস্বস্ত হয় উমা। কিছুক্ষণ বাদে উমা চলে যায়।

আর আমি অন্তহীন অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকি নিঃশব্দে। ব্যাকুল উমার শঙ্কাজড়ানো নিবিড় পরশটুকু গভীরভাবে রোমন্থন করি একা একা। ভাবি—আপন মনের মাধুরী মিশায়ে কবি কল্পনা করেন মানসী, সাহিত্যিক রচনা করেন নায়িকা, প্রেমিক গড়ে প্রেয়সী, দয়িতা সৃষ্টি করেন প্রেমময় পুরুষ। বাস্তব কল্পনার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যায়। বিরহে বাজে ব্যথা। বিচ্ছেদ আনে দুঃখ। কিন্তু এই দুঃখই যোগায় শক্তি। প্রেমকে দেয় প্রেরণা। আশায় বুক বাঁধে মানুষ। মিলনের দিন গোণে।

আমিও তাই করেছিলাম। কষ্ট করেও কেটে গেল দুটি বছর। তারপরে এলো রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পালা। শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মে যারা ছিল অচ্ছেদ্য—সেই গাড়োয়াল ও তিব্বতের মাঝে চীন নিষেধের প্রাচীর দিল তুলে। সে খবর আপনার অজানা নয় মহারাজ চলুন এবারে ওঠা যাক। ঐ যে ওঁরাও সবাই এসে গেছেন।”

## ॥ পাঁচ ॥

আরও আধ মাইল চড়াই ভেঙেছি। এ অংশটুকু আগের চেয়ে কম খাড়াই, তবে মোটেই সুগম নয়। না হলেও আমরা সে চড়াই পেরিয়ে এসেছি। অতিক্রম করেছি মহাভারতের উশীরধ্বজ মৈনাক, মেঘবর্ণ মেঘনাদ, ভদ্রকালী, কালশৌল ও হরি পর্বত।

তাদের এখন কি নামে ডাকা হয় জানি না। তবে এটুকু জানি যে পঞ্চ-স্বামীর সঙ্গে দ্রৌপদী যে মহাপ্রস্থানের পথে গমন করেছিলেন, আমরা এখন সেই পথের প্রায় প্রান্তে উপনীত। উপস্থিত হয়েছি দেও-দেখানীতে—যেখান থেকে দেবালয় বদ্রীনাথধাম প্রথম দেখা যায়।

আমরাও দেখতে পেয়েছি। হ্যাঁ, দেখছি সেই দেবতাদের ক্রীড়াভূমি ও মহাকবি বেদব্যাসের বাসভূমি। মিত্র ও বরুণ যেখানে এসে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন, অগ্নিদেব একদা যেখানে সদা প্রজ্বলিত থাকতেন, এই সেই রজগুণরহিত পুণ্যতীর্থ বদরিকাশ্রম। কিন্তু লোমশমুনি যে বলেছিলেন, একাগ্রচিত্ত হলে এখানে দেবতাদের চরণচিহ্ন দর্শন করা যায়। আমরা তো দর্শন করছিনা। আমরা কি তবে একাগ্রচিত্ত নই। লোভ মোহ কাম ক্রোধ বিসর্জন দিয়ে আমরা কি গোবিন্দপরায়ণ হতে পারি নি?

তবু আমরা যাব। মানসচক্ষে না পারি, চর্মচক্ষে দর্শন করব সত্ত্বগুণময় শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী সৃষ্টির পালনকর্তা দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে।

কিন্তু পূর্ণদার জন্য কি খুশীমত চলার উপায় আছে ? হঠাৎ হাঁক ছাড়েন তিনি, "কোথায় ছুটছ অমন টাট্টু ঘোড়ার মত। দাঁড়াও, একটু বসে নিই।"

অতএব পূর্ণদা পথে বসলেন।

আমরা পথে দাঁড়ালাম।

পথের পাশেই ছোট একটি খুপড়ি—পাথর দিয়ে তৈরি। ভেতরে একখানি সিঁদুর মাখানো পাথর। খুপড়ির চূড়ায় একটি লাঠি বাঁধা। তাতে রং-বেরংয়ের অসংখ্য ন্যাকড়া, সুতো ও দড়ি জড়ানো। পুণ্যলোভী পূর্ণদা লুব্ধ হলেন। ঝোলা থেকে তাঁর সেই অমূল্য দড়িগাছি বার করলেন। একবার তাতে সস্নেহ নজর বুলিয়ে···সেকি ! পূর্ণদা দড়ি খাবেন নাকি ? না দড়ির খানিকটা অংশ দাঁত দিয়ে কাটার চেষ্টা করছেন তিনি। তাই বা কম বিস্ময়ের কি ? মাল বাঁধার জন্য কত আবেদন নিবেদনের পরেও এই দড়িগাছা সেদিন সমীরকে দেননি পূর্ণদা। এমনকি সমীর যখন আশ্বাস দিল, 'বিশ্বাস করুন, আমি গলায় দেব না।' তখনও পূর্ণদা নরম হন নি। এহেন অমূল্য দড়িকে দন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করতে চাইছেন তিনি !

কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায় ? একান্ন বছরের দাঁত হার মানল। বাধ্য হয়ে তিনি পাথর ঠুকে দড়ি কেটে ফেললেন। তারপর সেই কর্তিত অংশটুকু লাঠির সঙ্গে বেঁধে দিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমরা নীরবে ভক্তিগদগদচিত্ত পূর্ণদার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিলাম। কিন্তু নীরব রইল না সমীর। এ সুযোগ হেলায় হারাবার পাত্র নয় সে, "আর কত ভেলকীই যে দেখাবেন।"

বিশ বছরের পুঁচকে ছোঁড়ার এ উক্তি বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নন পূর্ণদা। তাতে যদি তাঁর মনস্কামনা অপূর্ণ থেকে যায়, তাও ভাল। স্বভাবতই তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল। নিমিলিত নয়ন উন্মীলিত করে তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "বেয়ারাপনার একটা সীমা আছে সমীর।

"আমরা যে অসীমের রাজ্যে এসে পৌঁছেছি দাদা!" সমীর সহসা আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠে।

"তাই বলে তুমি আমার মনস্কামনায় বাধা দেবে?"

"আদি জীবনে বই ঠেঙ্গিয়েছেন, মধ্য জীবনে পুলিস, শেষ জীবনে ছাত্র ঠেঙ্গাচ্ছেন। আপনি তো মুক্ত পুরুষ। আপনার আবার কি কামনা থাকতে পারে?"

"আহাঃ। তুমি কেন ব্যক্তিগত ব্যাপারে বাধা দিচ্ছ সমীর?" রঞ্জন হঠাৎ সালিসীর জন্য মুখ খোলে, "কামনা-বাসনা হল গিয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপার—হৃদয়গতও বলতে পার। তুমি এ সবের কি বোঝ হে?"

ধমক খেয়ে সমীরের মুখে হাসি ফোটে।

একটু থেমে রঞ্জন আবার যোগ করে, "জানো জলধরবাবুর মত মোহমুক্ত যাত্রীও একদিন এখানে এসে উপলব্ধি করেছিলেন—'এ সংসারে রমণীহৃদয়ই একমাত্র স্পর্শমণি! দেবতার মহিমা যেখানে প্রবেশ করতে অক্ষম, সেখানেও সে আপার উজ্জ্বল মহিমা বিকাশ করে এবং পুরুষের কঠোর হৃদয়কেও পুণ্যময় ও পবিত্র করে তোলে।' এতকাল পূর্ণদা সেই স্পর্শমণির সন্ধান পান নি। তাই বলে চিবকাল তাঁর জীবনটা এমনি পাপভারনত ধূলিম্লান নির্জীব অনুজ্জ্বল ও অপবিত্র হয়ে থাকবে, সে গ্যারান্টি তোমায় কে দিল?"

আমি ও গদাদা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ি।

পূর্ণদাও আর গম্ভীর থাকতে পারেন না।

সমীর হাসতে হাসতে বলে, "তাই বলুন, তলে তলে এত? তাহলে কলকাতায় ফিরে গিয়েই আমরা একটা নেমন্তন্ন পাচ্ছি! হে বাবা বদ্রীনাথ! দোহাই তোমার, তুমি পূর্ণদার মনস্কামনা পূর্ণ কর।"

পেছনে পাহাড়ের ঢেউ, সামনে উৎরাই পথ। গিয়ে মিশেছে একটি বৃক্ষহীন বাদামী রংয়ের অসমতল উপত্যকায়। বর্ষাকালে অবশ্য রং পালটায়, নানা রংয়ের ফুল ফোটে। তিন মাইল দীর্ঘ, এক

মাইল প্রস্থ ডিম্বাকৃতি সুবিশাল উপত্যকা—৩০° ৪৪´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৯° ৩২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। উচ্চতা ১০,২৪৪ ফুট। তিন দিকে বরফাবৃত পর্বতচূড়া। নর ও নারায়ণ পর্বত। নারায়ণ পর্বতের পেছনে নীলকণ্ঠ—২১,৬৪০ ফুট। হিমালয়ের দুর্গমতম শৃঙ্গ ক-টির একটি। নীলকণ্ঠের পেছনে চৌখাম্বা—চারটি শৃঙ্গের এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। উচ্চতম শৃঙ্গটি ২৩,৪২০ ফুট। চৌখাম্বার পেছনেই কেদারনাথ।

উপত্যকার বুকে চিক চিক করছে একটি আঁকাবাঁকা রূপোলী রেখা—পুণ্যস্বরূপা মহানদী অলকানন্দা। প্রায় মে মাস পর্যন্ত সে থাকে বরফাবৃত। সেকালে বলা হত আকাশগঙ্গা। আকাশচারী মহাত্মা বালখিল্যগণ ও মহামান্য গন্ধর্বগণ প্রতিদিন সামগীত গেয়ে ও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে এই কল্যাণময় স্বর্গীয় ধারাকে বন্দনা করতেন। আসুন, আমরাও এই পুণ্যপ্রবাহকে প্রণাম করি।

তখন কিন্তু উপত্যকা এমন বৃক্ষহীন ছিল না। বদরী বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। আর ছিলেন নর ও নারায়ণ—দুজন ঋষি। ধর্মরাজ পত্নী মুক্তির গর্ভে বিষ্ণুর অংশে তাঁদের জন্ম। ভিন্ন শরীর হলেও, অভিন্ন হৃদয় ছিল তাঁদের। তাঁরা তপস্যা করতে এখানে এসেছিলেন। যথারীতি রাজ্যচ্যুতির আশংকায় ইন্দ্র তাঁদের তপোভঙ্গ করতে কামদেব ও অপ্সরাদের পাঠালেন। দেবরাজের সে প্রয়াস বিফল হল। উপরন্তু ঋষিদ্বয় নারীরত্ন উর্বশীকে সৃষ্টি করে পাঠালেন স্বর্গে। দেবরাজ তাঁকে গ্রহণ করে ধন্য হলেন। দেবতাদের মদগর্ব ও অপ্সরা-দের রূপগর্ব খর্ব হল।

এখানেই ছিল তাঁদের আশ্রম—নরনারায়ণ আশ্রম। সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারত না সে আশ্রমে। ধর্মহীন মানুষেরও প্রবেশ ছিল না সেখানে। তমোগুণ রহিত সেই পুণ্যময় আশ্রম সদা বেদ ও হোম-মন্ত্রে মুখরিত রইত। সেখানে পৌঁছিলে মানুষ ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত ও শোক বিস্মৃত হত।

নর ও নারায়ণ হাজার বছর ধরে তপস্যা করে শিবের দর্শন লাভ

করেছিলেন। তপে ভুলে ভোলানাথ তপস্বীর মনস্কামনা পূরণ করলেন—এই পুণ্যভূমিতে তিনি চিরকাল অবস্থানের অশ্বাস দিলেন।

কিন্তু বদ্রীনাথ তো শিবতীর্থ নয়। তপস্বী পেয়েছেন ঈশ্বরের আসন। পুণ্যকামী মানুষের দল যুগ যুগান্ত ধরে তাঁরই জয়গান গাইছেন এই পুণ্যভূমিতে এসে। কেন এমন হল ?

হিমালয় চিরকাল ভারতের সনাতন সংস্কৃতিকে রক্ষা করে এসেছে। ধর্মান্ধ মুসলমান সম্রাটগণ যখন মঠ ও মন্দির ধ্বংস করে ভারতের পুণ্যভূমি থেকে তার সনাতন সংস্কৃতিকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন, তখন যেমন করে হিমালয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মকে রক্ষা করেছে, তেমনি পূর্ববর্তী যুগেও আর্যরা যখন উত্তর ভারত থেকে অনার্যদের বিতাড়িত করলেন, তখনও হিমালয় ভারতের সেই আদি সন্তানদের আশ্রয় দিয়েছিল। আর সেই থেকেই হিমালয় হয়েছে শিবালয়।

হিমালয়ের অনন্ত অপূর্ব সুন্দর শাশ্বত রূপ আর্যদেরও আকর্ষণ করল। সেকালে একটি সাধারণ ধারণা ছিল যে উচ্চস্থানে দেবতারা বাস করেন। তাই অলিম্পাস পর্বত হয়েছে গ্রীক পুরাণের বিষ্ণুলোক, সিনাই মরুভূমির সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেণ্ট ক্যাথারীনের গীর্জা, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী কেদার-বদ্রী ও কৈলাস হয়েছে ভারতের পরম তীর্থ।

একই ধারণার বশবর্তী হয়ে হিন্দু বৌদ্ধ, জৈন পার্শী, খৃষ্টান ও ইহুদীরা এই সব তীর্থের স্থান নির্বাচন করেছেন। তাঁদের ধারণা হল—ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে কষ্ট করতে হয়। দুর্গম স্থানে অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে অসীম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

কিন্তু ইসলাম ভিন্ন মত পোষণ করেন। ভজনালয় হবে জনপদের কেন্দ্রস্থলে—আজানের সুর পৌঁছবে সবার কানে। তাই নির্জন স্থানে কোন মস্‌জিদ গড়ে ওঠেনি।

হিমালয়কে অনার্যশূন্য করে আর্যরা হিমালয়কে করতে চাইলেন

বিষ্ণুলোক। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আর্যরা সুবিধে করতে পারলেন না। কিরাত-দেবতা শিবের সঙ্গে আর্যদেবগণ পেরে উঠলেন না। বাধ্য হয়ে আর্যগণ সেই আত্মঘাতী সংগ্রাম বন্ধ করে অন্য পন্থার আশ্রয় নিলেন। আর্য-দেবতা বিষ্ণুর অবতার নরনারায়ণ, তপস্যা করে শিবকে তুষ্ট করলেন। আর্যরা অনার্য-ঈশ্বর শিবকে মহেশ্বর বলে মেনে নিলেন। শিব ঠাঁই পেলেন রামায়ণ, মহাভরত ও পুরাণে। সরল অনার্যরা শান্ত হল। কিন্তু বুদ্ধিমান আর্যগণ প্রতিষ্ঠা করলেন নারায়ণের আশ্রম—শিবলোকে বিষ্ণুলোক।

উপত্যকায় নেমে এলাম। এলাম বাস-পথ পায়ে চলা পথের সঙ্গমে। আমরা কিন্তু পায়ে চলা পথ দিয়েই এগিয়ে চলেছি। অযুত সহস্র মানুষের চরণ-রেণু চর্চিত এই পথ। এই পথের বুকেই একদিন দ্রৌপদী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। পঞ্চ-পাণ্ডবের অশ্রুধারায় সিক্ত হয়েছিল এই পথের ধূলি। অবশেষে শোক মোহ, কাম ক্রোধ বিসর্জন দিয়ে এই পথ দিয়েই তাঁরা এসেছিলেন বদরিকাশ্রমে, গিয়েছিলেন অমরাবতীর দিকে।

বাস পথ চলে গেছে বাঁ দিকে, উপত্যকার প্রান্ত দিয়ে, নর পর্বতের পা ছুঁয়ে। এপারে নর, ওপারে নারায়ণ—সেকালের নরনারায়ণ আশ্রমের স্মৃতি বহন করে চলেছে। বদ্রীনাথকে সুন্দর ও সমাহিত রূপদান করেছে। সভ্যতার স্বাভাবিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাহিত ভাব অনেকখানি হারিয়ে গেছে। যেটুকু আছে, বাস পথ চালু হলে, সেটুকুও যাবে মুছে।

অলকানন্দার ওপারে প্রাচীন বদ্রীনাথ। এপারে বসতি শুরু হয়েছে কয়েক বছর হল। কারণটা নেহাৎ প্রাকৃতিক। ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালে নারায়ণ পর্বত থেকে বরফের প্রবাহ নেমে এসে বদ্রীনাথের সমূহ ক্ষতি সাধন করেছিল। তাছাড়া ১৯৫৮ সালে অলকানন্দার বন্যায়ও ওপারের অনেক ক্ষতি হয়েছে। তাই এপারের দিকেই এখন সবার নজর পড়েছে। তৈরি হয়েছে কয়েকটি আধুনিক

ধর্মশালা, সরকারী দপ্তর ও হাসপাতাল। পথের দু-ধারেই বাড়িঘর বারো বছর আগে যখন এসেছিলাম, তখন এসব কিছুই ছিল না। বারো বছর পরে যদি আবার আসি, তখনও এমনি বিস্মিত হব—জগৎ পরিবর্তনশীল।

পথের বরফ পরিষ্কার করা হয়েছে। তাহলেও পথের ধারে, এখানে সেখানে, পাথরের আড়ালে থোকা থোকা বরফ আছে জমে। বরফ জমে আছে দুধারে বাড়ি ঘরের চালে। প্রভাতী সূর্য সোনালী আলো ছড়িয়েছে ওদের গায়ে। ওরা গলছে না তবে ঝলমল করছে।

এতক্ষণ যা ছিল অস্পষ্ট এবারে তা স্পষ্ট হল। দেখা গেল শিরোপরি স্বর্ণাভ অমৃতকুম্ভ। অমৃতময় তীর্থের পুণ্য প্রতীক। একটি নয়, দুটি নয় তিনটি। একের ওপরে এক, থরে থরে সাজানো। সূর্যালোকে জ্বল জ্বল করছে। ভক্ত হৃদয় মাঝে জ্বালিয়ে রেখেছে ভক্তির অনির্বাণ শিখা!

"বাবা বদ্রীবিশাল কি জয়।"

একদল যাত্রী যাচ্ছেন ফিরে। বিদায় বেলায় তাঁরা বদ্রীবিশালের জয়গান গাইছেন। দুর্গম পথ পরিক্রমার পরম প্রেরণা ঐ জয়গান। শুধু তীর্থের পথে নয়, জীবনের পথেও বটে।

পঞ্চতীর্থে ধন্য এই গিরিতীর্থ—ঋষিগঙ্গা কূর্মধারা প্রহ্লাদধারা তপ্তকুণ্ড ও নারদকুণ্ড। পাঁচটি শিলাও আছে এখানে—নারদশিলা, বরাহশিলা, মার্কণ্ডেয়শিলা, নৃসিংহশিলা ও গরুড়শিলা। এ ছাড়া রয়েছে ব্রহ্ম কপাল—একখানি সুবিরাট শিলা।

অলকানন্দা বদ্রীবিশালের চরণামৃতে চর্চিত পুণ্যধারা। ১৯৬৬ সালের ২২শে মে এখানে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পবিত্র চিতাভস্ম বিসর্জন দেয়া হয়েছে। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর পুত্র শ্রীহরিকিষণ দিল্লী থেকে ভস্মাধারটি এখানে বহন করে আনেন।

আমরা পুল পেরিয়ে এলাম। আনন্দ উচ্ছল অলকানন্দার

পুরনো পুল। এলাম প্রাচীন বদ্রীনাথে। এদিকে তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। সেই সিন্ধু-পাঞ্জাব ও কালিকমলীর ধর্মশালা, ডাকঘর ও সাক্ষীগোপালের মন্দির।

পথের দুধারে সেই সারি সারি দোকান আর সরু সরু গলি। অধিকাংশ গলিগুলোই গেছে ওপরে পাণ্ডাদের বাড়িতে। পাণ্ডাদের তেমন অত্যাচার নেই এখানে। তাহলেও মন্ত্র পড়ার সময় সচেতন থাকতে হয়। নইলে মন্ত্রের মধ্যে মোটা দক্ষিণা কবুল করিয়ে নেয়।

অবশেষে এলাম সেখানে, যেখানে আসার জন্য যুগ-যুগান্ত ধরে কত দুঃখ কষ্ট সয়েছেন, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, অগণিত পুণ্যকামী মানুষের দল। সামনেই সেই অলকাপুরী বদ্রীনারায়ণের অক্ষয় নিকেতন।

আহা! এমন রূপ তো দেখিনি সেবারে। সারা গায়ে গোলাপী আভা। এখানে গোলাপ ফোটে না তাই বোধ হয় গোলাপী রংয়ে মন্দিরের বহিরাংশ রাঙানো হয়েছে। রং দেয়া হয়েছে জানালায়, পাথরের কার্নিসে ও স্তম্ভে। তবে গোলাপী নয়, লাল ও নীল। নীল শুধু মাটিতে নয়, নীল রয়েছে আকাশে—যেন ঘন নীল একখানি চন্দ্রাতপ কেউ টাঙিয়ে দিয়েছে সারা বদ্রীনাথ জুড়ে।

আলোর এমন সমারোহ দেখি নি সেবারে। নানা রংয়ের বাল্‌বের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে মন্দির। তীর্থ প্রায় ভক্তশূন্য। কিন্তু মন্দির এখনও উৎসব মুখর।

ছ-সাত ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে সিংহদ্বারে পৌঁছতে হয়। সিংহদ্বার না বলে গোপুরম্ বলাই বোধ হয় উচিত হবে। তবে কারুকার্য দেখে মোগল স্থাপত্যের কথাই মনে হয়। জয়পুরের মহারাজা তৈরি করে দিয়েছেন। স্বভাবতঃই ইসলামী প্রভাব এর সারা গায়ে।

মন্দির ভেঙে বহু মসজিদ তৈরি হয়েছে। সে সব মসজিদের আনাচে-কানাচে ভারতীয় স্থাপত্যের নিদর্শন থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন মসজিদ না ভেঙে তৈরি করা হয়েছে যে

মন্দির, সে মন্দিরে ইসলামী প্রভাব বিচিত্র বৈকী। তবে এই বৈচিত্র্যই ভারতের ধর্ম—মেরেছো কলসীর কান্না, তাই বলে কি প্রেম দিব না? আঘাতের বদলে অলিঙ্গনই যে ভারতীয় ধর্মের অনুশাসন। তাই জেহাদের বদলে কোন ক্রুশেড হয় নি এদেশে।

॥ ছয় ॥

সিংহদ্বার পেরোলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ—পাথর দিয়ে বাঁধানো। বাইরের থেকে যাকে মন্দির বলে মনে হয়, তা ঠিক মন্দির নয়—প্রাঙ্গণের চারিপাশে বারান্দাযুক্ত সারি সারি ঘর, মন্দির কমিটির অফিস ও কর্মচারীদের কোয়ার্টার। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মনে হয় সবটা জুড়েই মন্দির।

প্রাঙ্গণের একদিকে মুণ্ডহীন ঘণ্টাকর্ণের মূর্তি। আরেকদিকের একখানি ঘরে লক্ষ্মীমূর্তি। পাশের ঘরই ভোগমণ্ডি—ভোগ রন্ধন গৃহ। ভোগ না বলে রাজভোগ বলাই উচিৎ হবে। ইলাহী কারবার—যাত্রার সময় মণ তিনেক চাল উনুনে চড়ে। ভোগ মণ্ডির পরে অফিস-ঘর—বদ্রীনাথ মন্দির সমিতির দপ্তর। প্রতি সন্ধ্যায় যাত্রীরা সারি বেঁধে নাম লেখান এখানে। এই রেজেস্ট্রীকরণকে বলা হয় 'আটকা'। রেজিস্টার্ড ভক্তবৃন্দ পরদিন দুপুরে ভোগ প্রসাদ পেয়ে থাকেন।

দপ্তরের আরও অনেক কাজ আছে। বদ্রীনাথ এখন রীতিমত শহর—টেম্পল সিটি। লক্ষাধিক তীর্থযাত্রী প্রতিবছর এই পুণ্যতীর্থ পরিক্রমায় আসেন। কাজেই তাদের বাসস্থান স্বাস্থ্যরক্ষা বিদ্যুৎ সরবরাহ রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ ইত্যাদি মিউনিসিপ্যালিটির যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে হয় এই দপ্তরকে। প্রণামী ও সরকারী সাহায্য মিলে বছরে ছয় লক্ষ টাকার মত আয় ও ব্যয় হয়। তাছাড়া পুজোর ব্যবস্থা, উপকরণ ও বিগ্রহের অলংকারের তত্ত্বাবধান তো রয়েছেই। সোনা ও রূপোর উপকরণ দিয়ে পুজো করা হয়

বদ্রীনারায়ণকে। পুজোর সময় প্রায় আধমণ সোনার উপকরণ ব্যবহৃত হয়।

আগে আরও বেশি হত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজক এ্যাট্‌কিন্‌সন ১৮৮২ সালে এখানে এসেছিলেন। তখন নাকি একমণ পাঁচ সের সোনার অলংকার ও চার মণ রূপোর উপকরণ ব্যবহৃত হত। পুজোর সময় বদ্রীনারায়ণকে বহুমূল্য পোশাক পরিচ্ছদে ভূষিত করা হত। তখনকার দিনেই এর মূল্য ছিল পাঁচ হাজার টাকা।

এ্যাট্‌কিন্‌সন এখানে আসার কয়েক বছর আগে, একবার এই সব অলংকার ও উপকরণ অপহৃত হয়ে যায়। মন্দির তখন ছিল বন্ধ—বদ্রীনাথ ছিল জনশূন্য। তবু অপহরণকারীরা ধরা পড়েছিল। সেই থেকেই সব উপকরণ ও অলংকার বের করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

সে আমলে কয়েকজন দেবদাসী ছিলেন এ মন্দিরে। তাঁরা প্রধান পুরোহিত রাওয়ালের উপপত্নীর মত ছিলেন। পরবর্তীকালে এই প্রথা রহিত হয়ে গেছে। এ্যাট্‌কিন্‌সনের প্রায় বিশ বছর পরে 'হোলী হিমালয়'-য়ের রচয়িতা পাদ্রী ওক্‌লে এসেছিলেন বদ্রীনাথে। তিনি দেবদাসীদের দেখেন নি। তবে তাঁদের কথা শুনেছেন।

কেরালার নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অর্থাৎ জ্যোতির্মঠের মঠাধ্যক্ষ মনোনীত হয়ে থাকেন। এ বিষয়ে একটা সাধারণ ধারণা আছে যে শঙ্করাচার্য এই নিয়ম চালু করে গেছেন, কারণ তিনি নিজে নাম্বুদ্রী বংশীয় ছিলেন। যে যুগাবতার মুমূর্ষু হিন্দুজাতির জীবনে নূতন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন, তিনি সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি, এ ধারণা অবিশ্বাস্য।

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য হিন্দুজাতিকে একতাবদ্ধ করার মানসে

ভারতের পাঁচ দিকে পাঁচটি মঠ স্থাপন করেছিলেন—পুরীতে গোবর্ধন মঠ, বিষ্ণু কাঞ্চীতে কামকোটি মঠ, শ্রীরঙ্গমে শৃঙ্গেরী মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ ও বদ্রীক্ষেত্রে জ্যোতির্মঠ। তিনি তাঁর পাঁচ জন প্রধান শিষ্যকে এই পাঁচ মঠের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এরা যে সকলেই নাম্বুদ্রী বংশীয় ছিলেন, তা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। যোগ্য বলেই তাঁরা এই পদ লাভ করেছিলেন, শঙ্করাচার্যের প্রিয়পাত্র বা আত্মীয় বলে নয়।

জ্যোতির্মঠের অধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্য শঙ্করাচার্য অথর্ব বেদের ওপর এক তর্কসভার আয়োজন করেছিলেন। অথর্ববেদ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের জনক। আর ঔষধির জনক হল হিমালয়। কাজেই শঙ্করাচার্য প্রথম তিনটি বেদের ওপর এই পরীক্ষা না নিয়ে, চতুর্থ বেদকে পরীক্ষার বিষয় বলে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে এই মঠাধ্যক্ষ শুধু দেবপূজাই করবেন না; সেই সঙ্গে ঔষধি নিয়ে গবেষণা করেও আয়ুর্বেদশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করবেন।

পরীক্ষায় প্রথম হলেন তোটকাচার্য—বাংলায় বলা যেতে পারে টোটকাচার্য। পরীক্ষার মাধ্যমে অধ্যক্ষ নির্বাচনের এই নিয়ম চালু ছিল চার শ' বছর। বদ্রীনাথের প্রধান পুরোহিত কেবল নারায়ণ সেবকই ছিলেন না, তিনি নরসেবাও করতেন—তিনি ছিলেন তৎকালীন হার্বাল রিসার্চ ইন্‌সটিটিউটের ডিরেক্টার।

পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস আজও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। তবে ইতিমধ্যে শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত প্রথা রহিত হয়ে যায়।

১৫৪৩ সাল থেকে ১৭৭৬ সাল পর্যন্ত 'স্বামী, নামধারী একুশ জন ব্রাহ্মণ বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রথম বিশজন নিজেরাই তাঁদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেছেন। কিন্তু শেষ স্বামী রামকৃষ্ণ কাউকে মনোনীত না করেই অকস্মাৎ ১৭৭৬ সালে দেহত্যাগ করেন। ফলে এই পরম-পদ প্রাপ্তির জন্য তাঁর শিষ্যদের মধ্যে চরম-দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। প্রধান

পুরোহিতের পদ রহিল শূন্য, বদ্রীনারায়ণের পূজা হল বন্ধ।

বাধ্য হয়ে গাড়োয়ালের রাজা প্রতাপশাহ্ ছুটে এলেন জোশীমঠে। শেষ পর্যন্ত তিনি বদ্রীনাথ মন্দিরের পাচক নাম্বুদ্রী বংশীয় গোপাল ব্রহ্মচারীকে প্রধান পুরোহিতের পদে অভিষিক্ত করলেন। তাঁকে রাওয়াল পদবী দিলেন, মণিমুক্তা খচিত রাজবেশ, স্বুবর্ণছত্র ও চামর দান করেলেন। রাজসিক আড়ম্বরের মধ্যে এই অভিষেক সম্পন্ন হল।

অতুল ঐশ্বর্য ও বিপুল পরাক্রমের অধিকারী হয়ে গোপাল আর ব্রহ্মচারী রইলেন না। তিনি এক গাড়োয়ালী রমণীর পাণিগ্রহণ করলেন। শতাব্দীর ঐতিহ্য অপসৃত হল, ব্রহ্মচর্যের প্রাধান্য লুপ্ত হল।

সংসারী গোপাল রাওয়াল তাঁর বংশধরদের মুখ চেয়ে, আচার্য শঙ্করের নাম করে বিধান দিয়ে গেলেন—নাম্বুদ্রী বংশীয় না হলে কেউ রাওয়াল হতে পারবে না। মিথ্যা শতবার প্রচারিত হলে সত্যে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে শঙ্করাচার্যই এই বিধান দিয়ে গেছেন।

গোপাল রাওয়ালের বিধান অনুযায়ী শুধু রাওয়াল মনোনীত হন নি। পরবর্তী রাওয়ালগণ গোপালের মতই সংসারী জীবন যাপন করেছেন। দার-পরিগ্রহ তাঁদের দেব-সেবার অন্তরায় হয় নি। অথচ অভিষেকের সময় প্রত্যেক রাওয়ালকেই একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে সাক্ষর করে শপথ নিতে হয় '···ম্যায় নিষ্কপট আওর্ স্বচ্ছ হৃদয়সে প্রতিজ্ঞা করতা হুঁ কি ম্যায় জব্ তক্ রাওয়াল পদ পর্ রহুঙ্গা, তব তক্ অবিবাহিত রহ কর ব্রহ্মচর্য কা পালন করতা হুয়া শুদ্ধ আচরণ পূর্বক শ্রীবদরীনারায়ণজীকে পূজন-অর্চন মে তৎপর্ রহুঙ্গা···'

যাই হোক পরবর্তী চারজন রাওয়াল মোটামুটি সৎ জীবন যাপন করে গেছেন। ১৮১৫ সালে রাওয়াল হলেন দ্বিতীয় নারায়ণ। তার পরিচর্যার জন্য টিহ্রীর ( গাড়োয়াল ) রাণী তাঁর এক পরিচারিকাকে

পাঠালেন এখানে। এই পরিচারিকাই বদ্রীনাথের প্রথম দেবদাসী। তারপরে প্রায় আশি বছর ধরে দেবদাসীরা রাওয়ালদের উপপত্নী রূপে বাস করেছেন এখানে। এই সময়ে রাওয়ালগণ নারায়ণ-সেবার চেয়ে নারী-সেবার দিকেই বেশি নজর দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই আমলেই এ্যাট্‌কিন্‌সন বদ্রীনাথে এসেছিলেন। ফলে সারা পৃথিবী তাঁদের সেই পদস্খলনের কাহিনী জানতে পেরেছে।

তারপর থেকেই এই পুণ্যভূমিকে পাপমুক্ত করার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায় পুণ্যার্থীদের মধ্যে। ফলে ১৯০১ সালে বাসুদেব রাওয়ালকে অপসারিত করে রাম রাওয়ালকে অভিষিক্ত করা হয়। মাত্র চার বছর সময় পেয়েছিলেন, কিন্তু তারই মধ্যে তিনি দেবদাসী প্রথা রহিত করেছিলেন। এই সময় পাদ্রী ওক্‌লে আসেন এখানে।

অনিবার্যভাবে সংগ্রামী রাম রাওয়ালের জীবনের যবনিকা নেমে আসে। নেহাৎ আকস্মিকভাবে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যু রহস্যাবৃত। হয়ত তিনিই এই পুণ্যভূমির প্রথম শহীদ।

দেবদাসী প্রথা লুপ্ত হল, কিন্তু বদ্রীনাথ পাপমুক্ত হল না। পদচ্যুত বাসুদেব আবার রাওয়াল হলেন। ব্যভিচারের বন্যায় বদ্রীনাথের আকাশ বাতাস কলুষিত হয়ে উঠল। এই অবস্থা চলল ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। যদিও এই কলঙ্কময় ইতিহাসের পরিসমাপ্তির জন্য একটা প্রচণ্ড আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯২৮ সালে।

এই আন্দোলনের জনক বেঙ্কটাচার্য—মাদ্রাজের একজন অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টার। অবসর নিয়ে তিনি এসেছিলেন বদ্রীনাথে—ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে শান্তি পেতে। কিন্তু অলকা-পুরীর অবস্থা দেখে তাঁর চিত্ত আরও অশান্ত হল। তিনি প্রতিবাদ করলেন, ফল হল না কোন। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। জনমত গঠনের জন্য নেমে গেলেন নিচে--সব তীর্থ ঘুরে ঘুরে কেদার-বদ্রীর রাওয়ালদের অপকীর্তির কথা প্রচার করতে থাকলেন। এগারো বছর ধরে এই আন্দোলন চলল।

অবশেষে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। ১৯৩৯ সালে উত্তর প্রদেশ সরকার বদ্রীনাথ মন্দির আইন পাশ করেন। তারপরে ১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৪৮ ছুবার ১৯৫০ সালে এই আইনের সংশোধন করা হয়েছে।

নৈবেদ্য আরতি কাঁসর-ঘণ্টা ও মন্ত্রপাঠ মানুষকে নারায়ণের সান্নিধ্যে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু নারায়ণকে পেতে হলে নরনারায়ণ হতে হয়। লোভ-মোহ কাম-ক্রোধ বিসর্জন দিয়ে গোবিন্দপরায়ণ না হলে গোবিন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বিগ্রহ—তীর্থ নয়, ভক্তই তীর্থ। মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত না হলে তীর্থ অর্থহীন। তাই তীর্থে রাজদণ্ডের প্রয়োজন। দেবভূমির পবিত্রতা রক্ষার জন্যও মানুষকে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে।

মূল-মন্দির হল প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে। আয়তনে খুবই ছোট, তিব্বতী গড়ন। সিংহদ্বারের সঙ্গে এর কোন মিল নেই।

কথিত আছে একদা বদরিকা-বনাশ্রিত ঋষিরা একযোগে প্রার্থনা করলেন, 'হে ভগবান! আপনি শাশ্বত নরনারায়ণরূপে এইস্থানে চিরবিরাজ করুন।'

ভক্তবৃন্দের আকুল আহ্বানে ভগবান নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁদের দর্শন দিয়ে বললেন, 'তথাস্তু! কিন্তু কলিকাল যে আসন্ন। তখন তো তোমরা আমাকে দর্শন করতে পারবে না?'

'কেন?' ঋষিগণ একযোগে বলে উঠলেন।

'কলিকালে আমি প্রায় ভক্তশূন্য হব। মানুষ তখন আপন বুদ্ধি ও বাহুবলের গরিমায় আমাকে বিস্মৃত হবে।'

'তাহলে?' ঋষিগণ ব্যাকুল হলেন, 'জগৎ যে রসাতলে যাবে।'

'না।' ভগবান অভয় দিলেন, 'নারদকুণ্ডে আমার ধ্যানমূর্তি আছে। তোমরা সেই মূর্তি এনে এখানে প্রতিষ্ঠা কর। ঐ মূর্তি

দর্শনে মানুষের আত্মদর্শন হবে, তারা সৎপথে পরিচালিত হবে এবং আমাকে লাভ করবে।'

ঋষিগণ আবার প্রার্থনায় বসলেন। তাঁদের প্রার্থনায় মুগ্ধ হয়ে দ্বাপরে ব্রহ্মাদিদেবগণ নারদকুণ্ড থেকে ধ্যানমূর্তি উত্তোলন করে তাঁকে বিশ্বকর্মা নির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নারদ নিজে হলেন প্রধান পুরোহিত।

পরবর্তীকালে এই ধ্যানমূর্তিকে পদ্মাসনা বুদ্ধমূর্তি ভেবে বৌদ্ধগণ বদ্রীনারায়ণের পুজো শুরু করেন। নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য এলেন উত্তরাখণ্ডে। তিনি তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধদের পরাজিত করলেন। বৌদ্ধরা তখন এই মূর্তিকে নারদকুণ্ডে বিসর্জন দিয়ে তিব্বতে চলে গেলেন। মূর্তি না পেয়ে শঙ্করাচার্য ধ্যানে বসলেন—জানতে পারলেন সব। তিনি তখন মূর্তিটি উদ্ধার করে তপ্তকুণ্ডের কাছে গরুড়কোটিতে প্রতিষ্ঠিত করে বদ্রীনাথকে হিন্দু-তীর্থ বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু পরে এই মূর্তি আবার একটি কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়। কয়েক শতাব্দী বাদে তা উদ্ধার করে ভগ্ন অবস্থায় এই মন্দিরে স্থান করা হয়েছে। তৎকালীন গাড়োয়ালের রাজা এই মন্দির নির্মাণ করে দেন এবং পরে রাণী অহল্যাবাঈ এর সংস্কারসাধন করেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে এই মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জয়পুরেরর মহারাজা আবার মূল-মন্দিরটি সংস্কার সাধন করে, বহিরাংশ নির্মাণ করে দেন। তাহলে মূল-মন্দিরের এমন নিখুঁত তিব্বতী গড়ন কেন? দক্ষিণ-ভারতীয় প্রভাব থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু তা নেই। এ থেকেই মনে হয়, শঙ্করাচার্যের আগে যখন বদ্রীনাথ বৌদ্ধতীর্থ ছিল, তখন নিশ্চয়ই এই মন্দিরের সংস্কার সাধন করা হয়েছে। শঙ্করাচার্যের পর থেকে বদ্রীনাথ হিন্দু তীর্থ। কিন্তু বৌদ্ধরা এখনও বদ্রীনারায়ণকে বুদ্ধাবতার জ্ঞানে পুজো করেন।

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মন্দির উন্মুক্ত হয়ে নভেম্বরের মাঝামাঝি রুদ্ধ হয়। শীতকালে এই অলকাপুরী তুষারে সমাধিস্থ থাকে।

সবাই নেমে যান নিচে। তবে ইদানীং তুষারাবৃত বদ্রীনাথেও মানুষ থাকেন এবং তাঁরা তুষার-মানব নন। তাঁরা ভারতের নওজোয়ান, যাঁরা আমাদের মাতৃভূমি রক্ষার তপস্যায় রত। আসুন, বদ্রীনারায়ণের সঙ্গে আমরা সেই বীর তপস্বীদেরও প্রণতি জানাই।

আমরা কিন্তু এখন মন্দিরে প্রবেশ করব না। শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ চিত্তে দর্শন করতে হয় বদ্রীনারায়ণকে। তপ্তকুণ্ডে স্নান করে দেহকে শুদ্ধ করে, শঙ্করাচার্যের গদীতে প্রণাম জানিয়ে চিত্তকে শুদ্ধ করে, তবে বদ্রীবিশালের সামনে উপস্থিত হতে হয়।

মন্দিরের উল্টোদিকেই মন্দির সমিতির পাঠাগার। বই খুব বেশি নেই, তবে দিন পাঁচেক আগের খবরের কাগজ পাওয়া যায়। সেই বাসি-খবরের জন্যই অনেকে ভিড় জমান এখানে। আজ দেখছি পাঠাগার বন্ধ। শীতের জন্য পাঠক ও গ্রন্থাগারিক উভয়েই বোধ করি বদ্রীনাথ থেকে বিদায় নিয়েছেন।

পাঠাগারের দুপাশ দিয়ে দুই সারি সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। এক সারি গেছে অলকানন্দার নতুন পুলের দিকে, আরেক সারি তপ্তকুণ্ডে। হিমতীর্থে তপ্তকুণ্ড। পুণ্যার্থীরা বলেন বাবা বদ্রীবিশালের মহিমা, পর্যটকরা বলেন প্রকৃতির অপার করুণা। স্নান করে পুণ্যার্থীরা ধন্য হন, পর্যটকরা তৃপ্ত হন। উভয়েরই শরীর মন সুস্থ হয়, দুর্গম পথ-পরিক্রমার ক্লান্তি দূর হয়।

সিঁড়ি পেরিয়েই মন্দির সমিতির রেস্ট হাউস। তিনতলা বাড়ি। তেতলা রাস্তার সমান উঁচু। একতলা ও দোতলার অধিবাসীদের তেতলা দিয়ে ঢুকে নিচে নামতে হয়। আমাদের কিন্তু নিচে নামতে হল না। যাত্রা প্রায় শেষ। রেস্ট হাউস যাত্রীশূন্য। তেতলার বড় হলঘরখানাই আমাদের ভাগ্যে জুটে গেল। মেঝেতে বেশ মোটা নরম কার্পেট বিছানো। এক পাশে ফায়ার প্লেস্, আরেক পাশে লাগোয়া বাথরুম। চমৎকার বন্দোবস্ত।

উৎফুল্ল পূর্ণদা বলে উঠলেন, "এ যে রাজসিক ব্যাপার হে!"

## ॥ সাত ॥

"শেঠজী! মহারাজ! জল্‌দি উঠিয়ে। ঈশী ভাগ্‌ গিয়া।"

রতনের ডাকে ধরমর করে উঠে বসি। শুধু আমি নয়, ওরা সবাই।

রতন আবার বলে, "ঈশী ভাগ্‌ গিয়া।"

চমকে উঠি। ঈশী পালিয়েছে? কোথায় পালাবে? কেন পালাবে? বলি, "কাছাকাছি কোথাও গেছে হয়তো। এখনই ফিরে আসবে। পালাবে কেন?"

"না মহারাজ। সে পালিয়েছে। তার কিট্‌ ব্যাগ ও কম্বল নেই।'

আঁতকে উঠি, "আর সব আছে তো? আমার ক্যামেরা··· বায়নোকুলার?"

"তোমার ক্যামেরা?" পূর্ণদাও আঁতকে ওঠেন।

কোন জবাব না দিয়ে আমি ছুটে চলি কুলিদের ঘরে। ওরাও আমাকে অনুসরণ করে।

আমাকে দেখেই মুচরা ও বচন উঠে দাঁড়ায়। রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করি, "কোথায় ঈশীর মালপত্র?"

"এইখানে ছিল। সব নিয়ে পালিয়েছে।" মুচরা আঙুল দিয়ে খালি জায়গাটুকু দেখিয়ে দেয়।

তবে আর কোন সন্দেহ নেই, ঈশী পালিয়েছে। আমার ক্যামেরা ও বায়নোকুলার চুরি করে পালিয়েছে। সে চোর? সে মিথ্যেবাদী? মিথ্যে কাহিনী বলে আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, ক্যামেরা ও বায়নোকুলার নিয়ে পালিয়েছে।

"এই কাগজগুলো ওখানে পড়ে ছিল।"

"কই দেখি।" ব্যস্তভাবে বচনের হাত থেকে কাগজ ক-খানি নিই। হিন্দীতে লেখা তিনটে পৃষ্ঠা। প্রথম পৃষ্ঠায় একখানি চিঠি—

নমস্তে মহারাজ,

আপনার ক্যামেরা ও দূরবীন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি। শুনেছি—চীনা সীমান্তরক্ষীরা এ দুটো জিনিসকে টাকা পয়সার চেয়েও বেশী পছন্দ করে।

জানি, চাইলে এর চেয়েও মূল্যবান জিনিস আপনার কাছ থেকে পেতাম। কিন্তু এই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আপনি আমাকে সীমান্ত অতিক্রম করতে দিতেন না। তাই, আমি এভাবে পালিয়ে যাচ্ছি।

এই সঙ্গে দু পৃষ্ঠা লেখা রেখে যাচ্ছি। পড়ে যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবেন। আমার হিন্দুস্থানের ভাইরা তাঁদের এক হতভাগ্য তিব্বতী ভাইয়ের চিন্তা-ধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন।

ক্যামেরার কেসে আপনার নাম ঠিকানা লেখা আছে। অদূর ভবিষ্যতে আবার আপনার সঙ্গে দেখা করব এই আশাতে বুক বেঁধে আজ বিদায় নিচ্ছি।

প্রণাম নেবেন।

আশীর্বাদ প্রার্থী

ঈশী

"দেখি চিঠিটা।" সমীর হাত বাড়ায়।

চিঠিটা সমীরের হাতে দিয়ে অন্য কাগজ দুখানিতে মনোনিবেশ করতে চাই।

পারি না। পূর্ণদা বলে ওঠেন, "তোমার ক্যামেরা ও বায়নোকুলার ওর কাছে গেল কেমন করে?"

"কাল চড়াইয়ের মুখে আমার বইতে কষ্ট হচ্ছে দেখে ও নিজেই চেয়ে নিয়েছে।"

"বদ্রীনাথ পৌঁছে ফেরৎ নাওনি কেন?" রঞ্জন বিরক্ত হয়েছে।

পূর্ণদা যোগ করেন, "তাহলে আর ঐ ছিঁচকেটা সর্বস্বান্ত করবে কেমন করে ?" একটু থামেন তিনি। তার পরে বলেন, "যাক্ ভালই হয়েছে। বোঝা বইতে কষ্ট হচ্ছিল তোমার, তাই তোমাকে চিরতরে ভারমুক্ত করে গেছে। হুঃ। এত কষ্ট করে বদ্রীনাথ এলাম, আর তার কোন সজীব ছবি থাকবে না। একমাত্র মুভি-ক্যামেরাটি বেহাত হল।" ক্যামেরার বিয়োগ ব্যাথায় পূর্ণদার বাকরুদ্ধ হয়ে আসে।

"যা হবার হয়ে গেছে। এবারে চলুন বেরিয়ে পড়া যাক। কুণ্ডে স্নান সেরে মন্দিরে যেতে হবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।" ধৈর্যশীল গদাদা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চান।

আমি বলি, "আপনারা তৈরি হয়ে নিন। আমি এই কাগজ দু-খানায় একবার নজর বুলিয়ে নিই।"

বিস্মিত হই। একি ঈশীর নিজের লেখা ? লিখেছে - 'এশিয়ার একটা ঐক্যবদ্ধ সত্তা আছে। সে সত্তা সৃষ্টি করেছে ধর্ম—ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম, সহায়তা করেছে চীনের তাওবাদ ও কনফুসিয়ানবাদ।

অনুকরণ নয়, আদর্শবাদের মধ্যেই এশিয়ার এই সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছিল। শিল্পকলাই এই সংস্কৃতির প্রসারতা সাধন করেছিল। এই যে নীল আকাশের নিচে নানা রংয়ের ছোট বড় মেঘের সমারোহ, পাইন বনের উদাস স্তব্ধতা, দুরন্ত সাগরের উদ্দাম ঊর্মিমালা এ-সব কিছুর মধ্যেই তো মিশে আছে শিল্পীর সত্তা, যে সত্তা অনন্ত-সুন্দরে ডুব দিয়ে 'ভূমা'র আনন্দকে স্পর্শ করে।

পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে এশিয়ার ভাবাদর্শে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, তা রোধ করতে হলে সেই প্রাচীন সত্তাকে নতুন করে উপলব্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে স্বভাবতঃই নেতৃত্বের দায়িত্ব ভারতের। কারণ মঙ্গোলীয় মনের ভারতীয়করণই একদিন এশিয়ার সংহতিকে গড়ে তুলেছিল।

চীন পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়ে এশিয়ার এই ঐক্যবদ্ধ সত্তাকে অস্বীকার করছে। দিগ্বিজয়ের মোহে তাকে বিনাশ করতে

চাইছে।

চিয়াং-কাইশেকের হাত থেকে মূল ভূখণ্ডকে ছিনিয়ে নিয়ে বর্তমান চীনা-সরকার অত্যন্ত জঙ্গী মনোভাবাভাপন্ন হয়ে পড়েছে। নিরস্ত্র তিব্বতের ওপর আঘাত হেনেই সে নিরস্ত হয় নি। ভারত আক্রমণ করে দেবতাত্মা হিমালয়ের শাশ্বত শান্তিকে ব্যাহত করেছে। ভুলে গেছে, যুগ-যুগান্ত ধরে ভারতের কাছে অযাচিত ভাবে অনেক পেয়েছে, অনেক নিয়েছে। নইলে চীনের ধর্ম সংস্কৃতি ও ভাস্কর্য আজও দরিদ্র হয়ে থাকত।

বুদ্ধের বাণী মানবাত্মার মুক্তির মহামন্ত্র—মিথ্যা পরিসংখ্যান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জাঁকজমকের বাইরে। চীন বিস্মৃত হয়েছে যে এই মহামন্ত্র একদিন এশিয়ার অন্তরাত্মাকে অধিকার করে নিয়েছিল আপন মহিমায়, বাহুবলের গরিমায় নয়।

আরব সৌজন্য বোধ, পারসীক কাব্য, জেরুজালেমের প্রেম ও ক্ষমা, চীনা নীতিশাস্ত্র ও ভারতীয় দর্শন নিয়েই এশিয়ার শান্তি। এই শান্তিকে আশ্রয় করে সারা এশিয়ায় একটি সাধারণ জীবনধারা গড়ে উঠেছিল। সে জীবনধারা হয়তো ভাষা ও ভূপ্রকৃতির জন্য বিভিন্ন রূপ নিয়েছে, কিন্তু কোথাও তার মূল-সত্তাটি হারিয়ে ফেলেনি।

তিব্বত দখল করে ও ভারত আক্রমণ করে চীন সেই ঐক্যবদ্ধ সত্তাকে অস্বীকার করেছে, ভগবান বুদ্ধের মহামন্ত্রকে অপমান করেছে।

যে শান্তি প্রতিটি হৃদয়ে কম্পমান, যে সংহতি রাজা ও প্রজায় পার্থক্য রাখে না, যে মুক্তিপূজা দারিদ্র্যের ওপরেও মহত্ত্বের ছায়াপাত করে—সেই শান্তি সংহতি ও পূজাই এশিয়ার সংস্কৃতি—দর্শন কাব্য ও শিল্পকলার গোপন শক্তি। এই ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে এশিয়া মিথ্যার পূজারীতে পরিণত হবে, তার চূড়ান্ত সর্বনাশ ডেকে আনবে,…’

“আচ্ছা, বললেই পারতে তুমি এখন মন্দিরে যাবে না। আমরা

তোমার জন্যে হা করে দাঁড়িয়ে আছি, আর তুমি এখানে কি ছাই-পাশ খুলে বসেছ ?"

রঞ্জনের ধমকে চমকে মুখ তুলি। লজ্জা পেয়ে বলি, "কেন তোমরা তো পুজো দিয়ে এলেই পারতে। আমি না হয় পরে পুজো দিতাম।"

"ঢের হয়েছে ভাই। এবারে চল দেখি। পুজো সেরে যত খুশি প্রিয়-বন্ধুর গদ্য-কবিতা পাঠ করো।" রঞ্জন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

শেষটুকু না পড়েই কাগজ দু-খানি পকেটে রেখে রঞ্জনকে অনুসরণ করি। জামা কাপড় ও গামছা নিয়ে রেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে আসি। সবার সঙ্গে কুণ্ডের দিকে এগিয়ে চলি। মানসিক অবস্থা যাই হক, পুজো দিতে হবে। নইলে তীর্থ দর্শন বৃথা।

সেবারে দেখেছি একটি, এবারে দেখছি তিনটি কুণ্ড। তৃতীয়টি তৈরি হয়েছে, তবে এখনও চালু হয় নি। প্রথমটি আদি কুণ্ড। সাড়ে ষোল ফুট লম্বা, সোয়া চোদ্দ ফুট চওড়া। জল ভীষণ গরম, প্রায় ১২০ ডিগ্রী ফ্যারেনহাইট।

সবাই দ্বিতীয়টিতে স্নান করছেন কারণ এর জল অপেক্ষাকৃত কম গরম। এই তপ্ত-কুণ্ডের উষ্ণধারার উৎস কোথায় জানি না। তবে এই ধারা গরুড় শিলার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে পড়েছে প্রথম কুণ্ডে। সেখান থেকে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে দ্বিতীয় কুণ্ডে। এর জলে স্নান করতে কোন অসুবিধে নেই। বরং বেশ আরামপ্রদ। ফলে পূর্ণদা ডুবে রইলেন। অনেক কষ্টে তাঁকে ডাঙ্গায় তোলা হল।

শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ চিত্তে চলেছি বদ্রীবিশাল সন্দর্শনে। কিন্তু আমার চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে কি ? ক্যামেরা ও বায়নোকুলারের জন্য আমার মন কি বিচলিত নয় ?

না, সবই বাবা বদ্রীবিশালের ইচ্ছা। তিনিই ঈশীকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছেন। ঈশী যদি ঘরে ফিরে যেতে পারে, তাহলে সে লাভের তুলনায় আমার ক্ষতি কতটুকু ?

সিঁড়ি বেয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। মন্দিরের দোরগোড়ায় কিউ দেবারি পাকা বন্দোবস্ত। সিনেমা হলের মত কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। হে কিউ! ধন্য তোমার মহিমা। বাবা বদ্রীবিশালও তোমার প্রভাব-মুক্ত নন।

মন্দিরে প্রবেশ করি। কাঠের দরজা, খুব বড় নয়। ঢুকেই নাটমঞ্চ—তবে চারিদিক উন্মুক্ত নয়। জানালাহীন দেয়ালে ঘেরা। এখানে বলে জগমোহন। যাত্রার সময় এখানে প্রবেশ করা রীতিমত কষ্টসাধ্য। যাত্রীদের ভিড়ে বোঝাই হয়ে থাকে।

আজ মন্দির প্রায় যাত্রীশূন্য। নেহাৎ সমাপ্তি-উৎসব দেখার জন্য আমাদেরই মত কয়েকজন কৌতূহলী বেপরোয়া প্রাণী এখনও এখানে রয়েছেন। আমরা অক্লেশে ঘণ্টা বাজিয়ে নাটমঞ্চ পেরিয়ে মূল-মন্দিরে প্রবেশ করি।

মূল-মন্দির দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ আয়তনে বড়। জন পনেরো যাত্রী কোনমতে দাঁড়াতে পারে। যাত্রার সময় বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া এখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য।

যাত্রীশূন্য মন্দিরের আজ অবারিত দ্বার। কাজেই আমরা এখানে আসতে পেরেছি।

যাত্রীশূন্য মন্দির কিন্তু শব্দশূন্য নয়। সশব্দে স্তোত্রপাঠ চলেছে। আমাদের বাঁদিকে দুজন ও ডানদিকে তিনজন পূজারী সুর করে একযোগে স্তোত্রপাঠ করছেন।

দ্বিতীয়াংশের দোরগোড়ায় আরেকজন পূজারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাওয়ালজীকে পুজোয় সাহায্য করছেন। রাওয়ালজীর গৌরকান্তি দেবদুর্লভ চেহারা। সদা হাস্যময় যুবক। বয়স অল্প হলেও, দেখে ভক্তি হয়।

দ্বিতীয়াংশকে বলা হয় গর্ভগৃহ, বদ্রীনারায়ণের বাসগৃহ। এ গৃহে রাওয়ালজী ছাড়া আর কারও প্রবেশের অধিকার নেই। মধ্যস্থলে বদ্রীনারায়ণ—মানুষের ভগবান। ধ্যানমগ্ন পদ্মাসীন চতুর্ভুজ মূর্তি।

কালো শালগ্রামশিলায় নির্মিত। মাথায় তাঁর সুবর্ণছত্র। তৃতীয় নয়নটি হীরক নির্মিত। দুহাতে তাঁর যোগমুদ্রা। অপর হাত দুটি দেহচ্যুত—কেবল চিহ্ন বর্তমান। হয়তো মানুষের পাপে নারায়ণের এই দশা। কিন্তু অনুতপ্ত মানুষ হাল ছাড়ে নি। তাই শৃঙ্গারের শেষে চন্দন দিয়ে সেই হাত দুখানি তৈরি করে নেয়।

বদ্রীবিশালের বাঁয়ে নর ও নারায়ণ মূর্তি। তাঁদের পাশে সুন্দরের আরাধ্যা শ্রীদেবী ও জগজ্জননী ভূদেবী। ডাইনে ঐশ্বর্যপতি কুবের, বিষ্ণুবাহন গরুড় ও সিদ্ধিদাতা গণেশ। কুবেরের মূর্তিটি পেতলের। সোনার হলেও আশ্চর্য হতাম না।

বদ্রীনারায়ণের সামনে দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণ-সখা উদ্ধব।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে উদ্ধব দ্বারকা থেকে এসেছিলেন এখানে। মিলিত হয়েছিলেন তপস্যারত নর ও নারায়ণের সঙ্গে। তারপরে বিষ্ণু-পদ নিঃসৃত পরম পবিত্রধারা অলকানন্দায় অবগাহন করে তাঁদের সঙ্গে নিজেও তপস্যারত হয়েছিলেন। সিদ্ধিলাভ করে তিনি এই পুণ্যতীর্থকে ভগবানের প্রিয়তম স্থান বলে উল্লেখ করেছেন।

ঘৃত প্রদীপের আলোয় আলোকিত মন্দির। ধূপের স্নিগ্ধ সুবাসে আমোদিত মন্দির। চুয়া-চন্দন ও শ্বেতপুষ্পে বিভূষিত মন্দির।

সমাপ্তি উৎসব সমাপ্তপ্রায়। উৎসবের শেষে আঠারো সের ঘি রেখে যাওয়া হবে ঐ প্রকাণ্ড প্রদীপে। ভক্তহীন বদ্রীনাথে ভক্তির অনির্বাণ শিখা বদ্রীবিশালকে ভাস্বর করে রাখবে।

তারপরে শোভাযাত্রা সহকারে সখা উদ্ধবকে নিয়ে যাওয়া হবে জোশীমঠে। রাওয়ালজী নগ্নপদে শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করবেন। শীতের ছ-মাস সেখানেই উদ্ধবকে পুজো করা হবে বদ্রীনারায়ণের প্রতিনিধিরূপে।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আবার তেমনি শোভাযাত্রা করে উদ্ধবকে নিয়ে আসা হবে এখানে। মন্দির-দ্বার যাবে খুলে। মৃত নগরী প্রাণ পাবে ফিরে। অলকানন্দা আনন্দিতা হবে। যাত্রীদল বদ্রীবিশালের

বন্দনা করে ধন্য হবেন।

পুজো সাঙ্গ হল। রাওয়ালজী ফিরে তাকালেন আমাদের দিকে। ইশারা করলেন পূজারীকে। তিনি আমাদের প্রসাদ দিলেন—বনতুলসীর মালা, কাঁচা বুটের ডাল, নারকেল মিছরী নকলদানা, মিঠাই ও মেওয়া। বদ্রীবিশালের পুষ্পহার থেকে দিলেন আশীর্বাদ।

আমরা পরম শ্রদ্ধায় সেই আশীর্বাদ মাথায় তুলে নিয়ে সর্বদুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দরের কাছে শান্তি কামনা করি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি। শান্তি শাশ্বত হক অশান্ত বিশ্বে।

বরণ করি জগজ্জননী ভূদেবীকে, স্মরণ করি পার্বতী-পিতা পর্বতরাজ হিমালয়কে—

'হিমালয়! জাগো! ওঠো আজি,
তব সীমা লয় হোক।
ভুলে যাও শোক—চোখে জল ব'ক,
শান্তির আজি শান্তি-নিলয় এ আলয় হোক!
ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক!
মা'র আবাহন-গীত্ চলুক!
দীপ জ্বলুক!
গীত্ চলুক!!
আজ কাঁপুক মানব-কলকল্লোলে কিশলয় সম নিখিল ব্যোম!
স্বা-গতম্!
স্বা গতম্!!
মা-তরম্!
মা-তরম্!!
ঐ ঐ ঐ বিশ্বকণ্ঠে
বন্দনা-বাণী লুণ্ঠে—"বন্দে মাতরম্!!"

# কেদার-বদ্রী যাত্রার দিনপঞ্জী

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১।২ | দিন | কলকাতা | থেকে | ঋষিকেশ | ৯২৯ | মাইল | রেলপথে | ৩৪ | ঘণ্টা লাগে |
| ৩ | „ | ঋষিকেশ | „ | দেবপ্রয়াগ | ৪৪ | „ | বাসপথে | ৩ | „ |
| | | দেবপ্রয়াগ | „ | শ্রীনগর | ২৩ | „ | „ | ২ | „ |
| | | শ্রীনগর | „ | রুদ্রপ্রয়াগ | ২১ | „ | „ | ২ | „ |
| | | রুদ্রপ্রয়াগ | „ | গুপ্তকাশী | ২৪॥ | „ | „ | ৩ | „ |
| ৪ | „ | গুপ্তকাশী | „ | নালা | ১॥ | „ | হাঁটাপথে | ১ | „ |
| | | নালা | „ | জুরাণি | ৪ | „ | „ | ২ | „ |
| | | জুরাণি | „ | ফাটা | ৩॥ | „ | „ | ২ | „ |
| | | ফাটা | „ | রামপুর | ৩ | „ | „ | ১॥ | „ |
| ৫ | „ | রামপুর | „ | ত্রিযুগীনারায়ণ | ৪॥ | „ | „ | ৩ | „ |
| | | ত্রিযুগীনারায়ণ | „ | গৌরীকুণ্ড | ৬॥ | „ | „ | ৩॥ | „ |
| ৬ | „ | গৌরীকুণ্ড | „ | রামওয়ারা | ৪ | „ | „ | ৩ | „ |
| | | রামওয়ারা | „ | কেদারনাথ | ৩ | „ | „ | ২ | „ |
| ৭ | „ | কেদারনাথ দর্শন ও বিশ্রাম | | | | | | | |
| ৮ | „ | কেদারনাথ থেকে গৌরীকুণ্ড | | | ৭ | „ | „ | ৪ | „ |
| ৯ | „ | গৌরীকুণ্ড | „ | ফাটা | ৯॥ | „ | „ | ৫ | „ |
| ১০ | „ | ফাটা | „ | গুপ্তকাশী | ৮॥ | „ | „ | ৪ | „ |
| ১১ | „ | গুপ্তকাশী | „ | রুদ্রপ্রয়াগ | ২৪॥ | „ | বাসপথে | ২॥ | „ |
| | | রুদ্রপ্রয়াগ | „ | কর্ণপ্রয়াগ | ২০ | „ | „ | ২ | „ |
| | | কর্ণপ্রয়াগ | „ | নন্দপ্রয়াগ | ১৩ | „ | „ | ১॥ | „ |
| | | নন্দপ্রয়াগ | „ | চামোলী | ৭ | „ | „ | ॥ | „ |
| | | চামোলী | „ | জোশীমঠ | ২৯ | „ | „ | ৩॥ | „ |
| ১২ | „ | জোশীমঠ | „ | বিষ্ণুপ্রয়াগ | ২ | „ | „ | } | |
| | | বিষ্ণুপ্রয়াগ | „ | গোবিন্দঘাট | ৫ | „ | „ | } ১ | „ |
| | | গোবিন্দঘাট | „ | পাণ্ডুকেশ্বর | ২ | „ | „ | } | |
| | | পাণ্ডুকেশ্বর | „ | হনুমান চটি | ৪ | „ | „ | ১॥ | „ |